স্বর্ণ-জ্যোৎস্না

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পুস্তকালয়
২৯, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা

দুই টাকা বার আনা

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

পুস্তকালয়, ২৯ বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা হইতে ডি, সি, ব্যানার্জি কর্তৃক প্রকাশিত ও পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪।১ মধু রায় লেন হইতে শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত। বেঙ্গল বাইণ্ডার্স বাঁধাই করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন।

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

সুহৃদ্বরেষু

বন-জ্যোৎস্না

জঙ্গলের মধ্যে জ্যোৎস্না পড়েছে।

দুপাশে নিবিড় শালের বন। কিন্তু নিবিড় হলেও পত্রাচ্ছাদন লতা-গুল্মে জটিল নয়—পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ। আলো-আঁধারির মায়ায় অপরূপ হয়ে আছে অরণ্য।

সরু পায়ে চলার পথ দিয়ে শিউকুমারী এগিয়ে চলেছিল। কাঁখের কলসী দেহের ললিত ছন্দে দোল খাচ্ছে—শুকনো শালের পাতা পায়ের নীচে যেন আনন্দে গান গেয়ে উঠছে। এই সন্ধ্যায় একা জঙ্গলের পথ নিরাপদ নয়। বাঘ আছে, ভালুক আছে, হাতী আছে, নীল গাই আছে, বরা আছে—কী নেই এই বিশাল অরণ্যে? তবু শিউকুমারীর ভয় করে না। তা ছাড়া ডুয়ার্সের বাঘ নিতান্তই বৈষ্ণব, পারতপক্ষে তারা মানুষের গায়ে থাবা তোলে না, এমনি একটা জনশ্রুতিতেও এদেশের লোক প্রগাঢ় ভাবে আস্থাবান।

বনের মধ্য দিয়ে একা চলেছে শিউকুমারী। গায়ের রূপোর গয়নায় জ্যোৎস্নার ঝিলিক। জঙ্গলের বুকে একটা গভীর ক্ষত-চিহ্নের মতো বিসর্পিল রেখায় ঝোরার জল যেখানে বয়ে

গেছে, সেখানকার ঘন-বিন্যস্ত ঝোপের ভেতর থেকে উঠছে বুনো ফুলের গন্ধ। জ্যোৎস্নায় মাতাল হয়ে ডেকে চলেছে হরিয়াল—পূর্ণিমা রাত্রির মায়ায় তারও চোখ থেকে ঘুম দূর হয়ে গেছে। শুধু থেকে থেকে কোথায় তীব্রস্বরে চীৎকার করছে একটা ময়ূর—পাখা ঝটপট করছে, হয়তো বেকায়দায় পেয়ে কোথাও আক্রমণ করেছে শিশু একটা পাইথনকে। অকৃপণ পূর্ণিমা আর অনাবরণ সৌন্দর্যের মধ্যেও আরণ্যক আদিম হিংসা নিজেকে ভুলতে পারেনি—হরিয়ালের স্থরে আর ময়ূরের ডাকে রুদ্র-মধুরের ঐকতান বেজে চলেছে।

বন জ্যোৎস্না।

জঙ্গল শেষ হতেই খরখরে বালি। পলি মাটির নরম কোমলতা নয়, মুক্তা-চূর্ণের মতো মিহি মখমল মসৃণ বালিও নয়। চূর্ণ পাথরের টুকরো এখানে কাঁকরের মতো ধারালো। ভরা বর্ষায় জলঢাকা যে সমস্ত পাথরের চাঙাড় হিমালয়ের বুক থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল, অতিকায় কতগুলো কচ্ছপের মত তারা সেই বিশাল বালি বিস্তারের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

ওপারে ভুটানের কালো পাহাড়। আর তলা দিয়ে ছেদহীন অনন্ত অরণ্য—ডুয়ার্স থেকে টেরাই। দুর্গমতার ওপারে প্রতিরোধের তর্জনী। দেবতাত্মা নাগাধিরাজের অলঙ্ঘ্য প্রাকার। আলোয় ধোয়া আকাশের নীচে পৃথিবীর বুক ঠেলে ওঠা কালো বিদ্রোহ। আর সামনে পাহাড়ী নদী জলঢাকা।

কতটুকু নদী, কতটুকুই বা জল। বুক পর্যন্তও ডুববে কিনা

সন্দেহ। দেখে মনে হয় পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্যন্তই—শুধু হেঁটে কেন, নৌকাতেও পার হওয়া চলে না। ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে দুর্দান্ত স্রোতে জল নেমে চলেছে, পাহাড় থেকে সমতলে, সমতল থেকে সমুদ্রে। স্বপ্ন থেকে হঠাৎ-জাগা নির্ঝরের বজ্র-গর্জন। জলের তলায় তলায় ঠেলে নিয়ে চলেছে বেলে পাথর আর গ্র্যানাইটের জগদ্দল স্তূপ। নীচে পাথরে পাথরে সঙ্ঘর্ষ—ওপরে খরখরে বালি ভেঙে জলের হুঙ্কার। এতটুকু নদীর কলরোল এক মাইল দূর থেকেও কানে আসে।

জ্যোৎস্নায় ঝলসে যাচ্ছে জলঢাকা। শান্ত ঘুমন্ত আলোর বাঁকা তলোয়ার নয়। পাহাড়ীরা যাকে সোনালি অজগর বলে এ যেন ঠিক তাই। ক্ষুধার্ত সোনালি অজগরের মতো গর্জন করে এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে—যেন মুখ থেকে ছিটকে পালিয়ে যাওয়া শিকারের সন্ধানে তার অভিযান।

কাঁখে কল্‌সী নিয়ে শিউকুমারী স্থির হয়ে দাঁড়ালো খানিকক্ষণ। পেছনে অরণ্য, ওপারে অরণ্য আর পাহাড়, মাঝখানে নদী। আকাশে চাঁদ।

ভারী খুশি লাগছে মনটা। আনন্দে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। এমনি জ্যোৎস্না রাতেই তো 'পিতমে'র আসবার কথা। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নেমেছে উৎরাইয়ের পথ। দুধারে শালের বন হাওয়ায় কাঁপছে। পাহাড়ী ঝাউয়ের একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। জংলী কলার পাতাগুলো কাঁপছে, কাঁপছে

জ্যোৎস্নার রঙ মেখে। আর সেই পথ বেয়ে নামছে ঘোড়া, নেমে আসছে ঘোড়-সওয়ার। খট্ খট্ খটাখট্। বুকের রক্তে মাতলামির দোলা লেগেছে, সমস্ত শিরাস্নায়ু চকিত হয়ে উঠেছে অধীর এবং উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়। 'পিতম' আসছে অভিসারে।

একটা গানের কলি গুন গুন করে দু পা এগিয়ে আসতে না আসতেই আবার শিউকুমারীকে থেমে পড়তে হল। আকাশের চাঁদে আর মায়াময় পৃথিবীতে মিলে বন-জ্যোৎস্নার যে অপূর্ব সুর বাজছিল—হঠাৎ সে সুর কেটে গেছে। ভয়ে আর আশঙ্কায় সমস্ত শরীর চন চন করে উঠল।

জলের ধারে সাদামতো ওটা কী পড়ে আছে? পাথর? না—পাথর নয়। বিকেলেও শিউকুমারী ওখানে গা ধুয়ে গেছে, তখন তো ওটা ছিল না। আর এতটুকু সময়ের মধ্যে অত বড় একখানা পাথর তো আর হাওয়ার মুখে উড়ে আসেনি। তা হলে?

নিশ্চয় মানুষ। কিন্তু মানুষ এল কী করে? কেউ খুন করেছে নাকি? জানোয়ারে মেরে দিয়েছে? দুটোই সম্ভব। নন্‌রেগুলেটেড্ এরিয়া—আইনের বন্ধন এখানে শিথিল। অরণ্য-রাজ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে আরণ্যক মানুষেরাই, সেজন্যে তাদের সদরে আদালতে ছুটে যেতে হয় না। আর সন্ধ্যেবেলায় দু'চারটে জানোয়ারের জলের কাছে আনাগোনাও খুবই সম্ভব। বিশেষ করে ভালুকের আমদানীটা এ তল্লাটে এমনিতেই একটু বেশি।

কয়েক মুহূর্ত শিউকুমারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে? এগিয়ে যাবে ওখানে? কে জানে কোনো অনিশ্চিত বিপদ ওখানে প্রতীক্ষা করে আছে কি না। এই জঙ্গল আর জনহীন নদীর ধার। সে এখানে বিপদ-আপদ এলে সে কী করতে পারে!

কিন্তু ইতস্তত করে লাভ নেই। দেখাই যাক না। ভুটানী মেয়ের নির্ভীক নিঃসংশয় মন আত্মস্থ হয়ে উঠল ক্রমশ। ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল সে।

মানুষই বটে। কিন্তু বিদেশী—বাঙালি। জলের ধারে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। ভালুকে খায় নি, তা হলে চোখ-নাক নিশ্চয় আস্তো থাকত না। গায়ে কোথাও রক্তের দাগ নেই—ক্ষতচিহ্ন নেই কোনোখানে। কাপড়টা গোছানোই আছে, শাদা জামাটার সোনার বোতামগুলো আলোতে ঝিকিয়ে উঠছে। আর, আর—কী আশ্চর্য, মানুষটা মরে নি। সমস্ত শরীরে ঢেউয়ের মতো দোলা দিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস উঠছে তার, নিঃশ্বাস পড়ছে। কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে নিশ্চয়।

তারপরে আর ভাবতে হল না শিউকুমারীকে। কলসী ভরে সে জলঢাকার জ্যোৎস্নায় গলা তুহিন্ শীতল জল নিয়ে এল, সস্নেহে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটার পাশে। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে একটুখানি উড়ানির হাওয়া দিতেই অজ্ঞান মানুষের দীর্ঘায়ত ক্লান্ত নিশ্বাস ক্রমশ সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে

আসতে লাগল। আরো খানিক পরে চোখ মেলল মহীতোষ। বিহ্বল অর্থহীন দৃষ্টি। সমস্ত চিন্তা যেন মস্তিষ্কের মধ্যে অস্পষ্ট নীহারিকার মতো দ্রুত লয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে। খণ্ড খণ্ড, ছিন্ন ছিন্ন। রূপ নেই, আকার নেই, অর্থ-সঙ্গতি নেই।

আরো জোরে জোরে হাওয়া দিতে লাগল শিউকুমারী। আরো বেশি করে ছিটিয়ে দিলে জল। জলঢাকার বরফগলা স্পর্শে মরা-মানুষ চমকে উঠতে পারে, আর মহীতোষ তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছে মাত্র। আস্তে আস্তে মহীতোষ উঠে বসল।

সামনে তরুণী নারী। উদ্বিগ্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার কালো চোখে জ্যোৎস্না, সুন্দর মুখখানাতে জ্যোৎস্না, কর্ণাভরণে জ্যোৎস্না। পাশ দিয়ে তীব্র কলরোলে বয়ে যাচ্ছে জলঢাকা। পুলিশ নয়, পেছনে ছুটে-আসা শত্রুও নয়। গতিশীল, ভয়ত্রস্ত উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের সমস্ত চঞ্চলতা যেন এখানে এসে স্থির আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আকাশ থেকে স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে কি পরী এসে নেমেছে তার পাশে? অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদে কি শেষ পর্যন্ত মরে গেছে মহীতোষ, আর মৃত্যুর পরে পৌঁছে গেছে একটা আশ্চর্য জগতে!

মর্মরশুভ্রা বিদেশিনী তরুণী। মূর্তির মতো অপলক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে—বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা একসঙ্গেই সে দৃষ্টির মধ্যে কথা কয়ে উঠেছে। কিন্তু মর্মরমূর্তি নয়, পরী নয়, মানুষই বটে।

মহীতোষ বললে, আমি কোথায় ?

হিন্দী-মেশানো বাঙলায় জবাব দিলে মেয়েটি : নদীর ধারে।

নদীর ধারে ! মহীতোষের মনে পড়ে গেল। পালিয়ে আসছিল—সে আর অরবিন্দ। শালবনের মধ্যে অরবিন্দ কোথায় হারিয়ে গেল—তার আর সন্ধান মিলল না। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই, প্রতীক্ষা করবার উপায় নেই। পালাও, পালাও, আরো জোরে পালিয়ে চল। আগের দিন কিছু খাওয়া হয়নি, সারা রাতের মধ্যে চোখ বুজবার উপায় ছিল না, একটিবারও। ক্ষিদে-তেষ্টায় সমস্ত শরীরটা অসাড় আর শিথিল হয়ে গেছে। তারপরপর ছুটতে ছুটতে সামনে পড়ল জল। পিপাসার্ত পশুর মতো সেদিকে ছুটে এল মহীতোষ। তারও পরে ? আর কিছু মনে পড়ে না।

মেয়েটি আবার বললে, কী করে এলে এখানে ?

জবাব দিলে না মহীতোষ। কী জবাব দেবে, কেমন করে জবাব দেবে। অবসাদে ভারী আচ্ছন্ন চোখ দুটো উদাসভাবে মেলে দিয়ে সে তাকিয়ে রইল ওপারের ঘনান্ধকার অরণ্য আর কালোপাহাড়ের অতিকায় দিগ্‌-বিস্তারের দিকে।

শিউকুমারী বললে, উঠতে পারবে ? তা হলে চলো আমাদের ঘরে।

মহীতোষ তবুও ভাবছে। কোথায় যাবে সে। কোন্‌খানে

তাকে নিয়ে যাবে এই অপরিচিতা রহস্যময়ী মেয়েটি! কোন অজ্ঞাত পৃথিবীর আমন্ত্রণ তার দৃষ্টিতে?

মহীতোষ শেষ পর্যন্ত উঠেই দাঁড়ালো। ক্লান্তিতে সর্ব শরীর কাঁপছে, মাথাটা ঘুরে পড়তে চাইছে মাটিতে। এক কাঁধে কলসী ধরে আর একখানা হাত অসংকোচে শিউকুমারী এগিয়ে দিলে মহীতোষের দিকে : নাও, আমার হাত ধরে চলো।

অন্য সময় হলে দ্বিধা করত মহীতোষ। সহজাত শিক্ষা আর সংস্কারে একটি অজানা অচেনা তরুণী মেয়ের শুভ্র হাতখানিকে আশ্রয় করবার কল্পনাতেও রক্তে দোলা লেগে যেত। কিন্তু চেতনা তখনো সম্পূর্ণ বিকসিত হয়ে ওঠেনি। যেন অর্ধতন্দ্রায়, অথবা পরিপূর্ণ স্বপ্নের মধ্যেই সে খেয়াল দেখছে। চাঁদের আলোয়, বালিতে, জল-কল্লোলে আর বনের মর্মরে সমস্ত পৃথিবীটাই তো অবাস্তব হয়ে গেছে। মন এখানে প্রশ্ন করে না, দ্বিধা করে না। এমন একটা আশ্চর্য পটভূমিতে সবই সম্ভব, সবই স্বাভাবিক।

শিউকুমারীর ভিজে ঠাণ্ডা হাতটা আঁকড়ে ধরলে মহীতোষ। সুগঠিত সুঠাম দেহের ওপর সমস্ত শরীরের ভারটাই এলিয়ে দিয়ে বালির ওপরে পা টেনে টেনে এগিয়ে চলল সে। একটা সুগন্ধি নাসারন্ধ্র বয়ে যেন তার স্নায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কিন্তু সে গন্ধ মেয়েটির দেহ থেকে, অরণ্য থেকে, না আকাশের চাঁদ থেকে—মহীতোষ ঠিক বুঝতে পারল না।

বালির রেখা ছাড়িয়ে জঙ্গল। শালবনের ভেতর দিয়ে মানুষ, হরিণ আর ভালুকের চলার পথ। ঝরা শালপাতায় পদধ্বনির মর্মরিত প্রতিধ্বনি। ময়ূর ডাকছে না, কিন্তু হরিয়ালের মাদক সুর ভেসে যাচ্ছে বাতাসে। হিংস্র জানোয়ারের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে না কোথাও। চকিতের জন্যে কানে এল হরিণের মিষ্টি আহ্বান। এমন অপূর্ব বন-জ্যোৎস্নায় সে হয়তো হরিণীকেই সন্ধান করে ফিরছে। কঁক-কঁক-কোঁ। ঝোপের মধ্য থেকে অস্পষ্ট গদ্‌গদ-ধ্বনি। বন-মোরগ দম্পতি হয়তো মিলন মায়ায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে কোথাও।

বন-জ্যোৎস্না। শিউকুমারীর মনে পড়ে এমনি রাত্রে আসবে পিতম। জংলী কলার পাতার ছায়া কাঁপছে পাহাড়ী পথে। ঝাউয়ের বনে উদাস বিরহাতুর দীর্ঘশ্বাস। আর পাথরবাঁধা পথ দিয়ে সাদা ঘোড়ায় খট্‌খট্‌ সোয়ারী হয়ে আসছে দূরবাসী প্রিয়তম—শালের কুঞ্জে বাসর যাপন।

শিউকুমারী কি গুনগুন করে গান গাচ্ছে? মহীতোষ কিছু বুঝতে পারছে না। চেতনা ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে। এই জ্যোৎস্নায়, বনের এই সংগীতে, এই রহস্যমধুর পথচলার ছন্দে। শিউকুমারীর গায়ের ওপর ভারটা ক্রমশ বেশি হয়ে চেপে পড়ছে। মহীতোষ আবার কি ঘুমিয়ে পড়ল না অজ্ঞান হয়ে গেল একেবারে?

জঙ্গলের এদিকটা অনেকখানি ফাঁকা। ডি-ফরেষ্টেশনের প্রভাবে জঙ্গল হালকা হয়ে গেছে—ওদিকে তো একেবারেই নেই। মানুষের কুঠারের ঘা পড়েছে অরণ্যের অপ্রতিহত সাম্রাজ্যে। কাঠ চাই। ইন্ধনের জন্য, আশ্রয়ের জন্য, সভ্যতার সংখ্যাতীত প্রয়োজনের জন্য, এমনকি জঙ্গল সংহার করবার কুঠারের বাঁটের জন্য। ক্ষত-বিক্ষত অরণ্য দিনের পর দিন হ্রস্ব হয়ে আসছে, অন্তিম প্রতিবাদে ছোট বড় গাছ আর একরাশ লতাগুল্ম দলিত করে লুটিয়ে পড়ছে বৃদ্ধ বনস্পতি, মানুষের অবিশ্রান্ত দাবীর মুখে পৃথিবীর প্রথম অধিবাসীরা নিঃশব্দে আত্মদান করে চলেছে। শুধু ব্যথাতুর বুকের মধ্যে সঞ্চিত জ্বালা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে দাবানল হয়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। শুকনো পাতায় ধূধূ শিখা জ্বালিয়ে আর লতাগুল্মকে পুড়িয়ে দিয়ে শাঁ শাঁ করে এদিকে ওদিকে সরীসৃপ-গতিতে আগুনের প্রবাহ চলে জলস্রোতের মতো। এঁকেবেঁকে এগিয়ে যায়—সোজা চলতে চলতে হঠাৎ ডাইনে বাঁয়ে মোড় ঘোরে। বনানীর বুকের জ্বালা আগুনের সাপ হয়ে ছুটোছুটি করে একদিন, দুদিন, তিনদিন—যে পর্যন্ত না শাল-বনের ডালে ডালে ময়ূরের পেখম ছড়িয়ে দিয়ে হিমালয়ের চূড়ো থেকে আসা নীল মেঘে ধারাবর্ষণ নামে।

জঙ্গল যেখানে হালকা হয়ে এসেছে সেখানে ভুটানীদের

একটা ছোট বস্তি। দেশটা কিন্তু ভুটান নয়—বাঙলা দেশের একেবারে উত্তরাঞ্চল। পাহাড়, ঝর্ণা, জঙ্গল আর চা বাগান। চা আর কাঠের প্রয়োজনে একটু দূরেই ঘন বনের মধ্য দিয়ে ছোট একটি রেল লাইন—তার ওপর দিয়ে যে রেল গাড়ি চলে তা আরো ছোট। বুনো হাতী দেখলে ইঞ্জিন ব্যাক করে—শাল গাছ পড়লে গাড়ির চলাচলতি বন্ধ হয়ে থাকে। নন্‌রেগুলেটেড অঞ্চল, থানা পুলিশের উপদ্রবটা গৌণ বস্তু। একজন সার্কল অফিসার আছেন, কিন্তু তিনি কোথায় আছেন অথবা কী করেন সেটা নিরাকার ব্রহ্মের মতোই গুরুতর তত্ত্ব-চিন্তা সাপেক্ষ।

এইখানে—চা বাগান, কাঠের কারবার আর রেল লাইনের সীমানা থেকে কিছুটা দূরে সরে এসে, কুলবীরের পচাইয়ের দোকান। চা-বাগান আর কাঠ-কাটা কুলিদের প্রাণরস সঞ্চয়ের কেন্দ্র। সন্ধ্যায় জঙ্গলের পথ-ঘাট ভালো নয়, আপদ-বিপদের সম্ভাবনাও আছে; তবু কুলিরা এখানে আসে—দিনান্তে উগ্র মাদকতায় একবারটি গলা ভিজিয়ে না নিলে তাদের চলে না। কুলবীরের রোজগার যে প্রচুর তা নয়, তবু দিন কাটে, চলে যায় একরকম করে।

রাত বাড়ছে। জঙ্গলের আড়ালে চাঁদ উঠে আসছে মাথার ওপর। কোথা থেকে চীৎকার করছে হায়না। কুলিরা একে একে উঠে পড়ল সবাই, সাঁওতাল কুলিদের মাদলের শব্দ আর জড়িত গানের সুর ক্রমে মিলিয়ে এল দূরে। হঠাৎ কুলবীরের

খেয়াল হল মেয়ে শিউকুমারী এখনো ফেরেনি। নদীতে জল আনতে গিয়েছিল, তারপর—

কুলবীরের মনটা চমকে উঠল। জানোয়ারের পাল্লায় পড়েনি তো? ঝকঝকে ভোজালিখানা খাপে পুরে নিয়ে সবে বেরিয়ে পড়তে যাবে এমন সময় এল শিউকুমারী। একা নয়, কাঁধে ভর দিয়ে আসছে মহীতোষ। আর আসছে বললেই কথাটা ঠিক হয় না, শিউকুমারী বয়ে আনছে তাকে।

কুলবীর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। ছোট ছোট মঙ্গোলীয়ান চোখ দুটো বিস্ফারিত করে অস্ফুট গলায় বললে, একি?

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শিউকুমারী বললে চুপ। একে কিছু খেতে দিয়ে এখন শোবার ব্যবস্থা করে দাও বাবা। যা শোনবার শুনো সকালে।

কুলবীরের একটা পা কাঠে তৈরী। ১৯১৪ সালের লড়াই ফেরৎ লোক সে। ফ্ল্যাণ্ডার্স, কামানের গর্জন—ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট। শেলের টুকরোতে বাঁ পাখানা হয়তো উড়ে গিয়ে ইংলিশ চ্যানেলেই আশ্রয় নিয়েছে।

যুদ্ধ থামল, কুলবীর ফিরে এল দেশে। ভুটান সরকার কিছু কিছু জমি জমা দিলে, রাজভক্তির পুরস্কার। কিন্তু সেই জমি নিয়েই শেষ পর্যন্ত বাধল নানা গণ্ডগোল। বুড়ো কুলবীরের

এসব ঝামেলো ভালো লাগলো না। একদিন সকালে ছুটো টাট্টু ঘোড়ার পিঠে সব চাপিয়ে দিয়ে, ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে জল-ঢাকার হিম-শীতল তীক্ষ্ণধারা পার হয়ে সে চলে এল ডুয়ার্সের জঙ্গলে।

তারপর দিন কেটে চলেছে। ভালোয় মন্দে, ছোট বড় সুখ দুঃখে। সাত বছরের মেয়ে শিউকুমারীর বয়স এখন উনিশ। দিনের পর দিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে কুলবীর, অথর্ব হয়ে পড়ছে। একটা পায়ের অভাবে বুনো ঘোড়ার মতো তেজীয়ান শরীরেও শিথিলতার সঞ্চার হয়েছে খানিকটা। অনেকটা এই কারণেই এতদিন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি শিউকুমারীর। বুড়ো বয়সে কুলবীরের অন্ধের যষ্টি।

রাত্রির অন্ধকারে দেখা যায় নি, এখন প্রথম সূর্যের আলোয় দিগন্তে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চন জঙ্ঘার সোনালি চূড়ো। শালবনকে অত ঘন বিন্যস্ত বলে বোধ হচ্ছে না। পাহাড়ের রেখাটা গাঢ় নীলিমা দিয়ে আঁকা, রাশি রাশি কুঞ্চিত লোমের মতো ঘন জঙ্গল তার সর্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়ে আছে।

হুঁকো হাতে নিয়ে দড়ির খাটিয়ায় বসে মহীতোষের ইতিহাস সবটা শুনল কুলবীর। চাপা তামাটে মুখখানার ওপর দিয়ে সংশয়ের নিবিড় ছায়া ছড়িয়ে পড়ল।

—এখানে কেমন করে তোমাকে থাকতে দেব বাবু? ইংরেজের মুলুক। আমার দেশ ভুটান হলে তো কথা ছিল না, কিন্তু এখানে—

পচাইয়ের একটা হাঁড়ি নিয়ে শিউকুমারী বেরিয়ে এল বাইরে। বনজ্যোৎস্নায় যাকে অপরূপ স্বপ্নময়ী বলে মনে হয়েছিল, দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল ততটা সুন্দরী সে নয়। খর্ব নাসিকা, ছোট ছোট চোখ। পরনের উড়ানিটার রং ময়লা। ফর্সা মুখখানার ওপরে স্বাভাবিক অযত্নের একটা মলিন রেখা পড়েছে, গলার খাঁজে কালো হয়ে জমে আছে ময়লা। অপগতক্লান্তি সুস্থ শিক্ষিত মহীতোষের যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল। নিতান্ত সাধারণ, নিতান্তই পথে ঘাটে দেখা পাহাড়ী মেয়ে। বনজ্যোৎস্না আর সোনালী অজগরের মতো খর-ধারা নদীর পটভূমিতে আলোর পাখায় যে ভর দিয়ে নেমে এসেছিল, সে যেন নিতান্তই অন্য লোক।

মহীতোষ কোনো জবাব দিলে না কুলবীরের কথায়, জবাবটা দিলে শিউকুমারী। বললে, না বাবা, বাঙালি বাবুকে কটা দিন রাখতেই হবে। এখন এখান থেকে বেরোলেই অংরেজ ধরে নেবে ওকে। তুমিত স্বাধীন ভুটিয়া, স্বাধীন বাঙালিকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করছ কেন?

এবার চমকাবার পালা মহীতোষের। আশ্চর্য এমন একটা কথা এই নোংরা পাহাড়ী মেয়েটা বলতে পারল কী করে? একি স্বাধীন পাহাড়ী রক্তের থেকে স্বতোৎসারিত অথবা এই আরণ্যক উন্মুক্ত পৃথিবীর প্রভাব? মহীতোষ তাকিয়ে রইল শিউকুমারীর দিকে। সুগঠিত কঠিন দেহ—লালিত্যের চাইতে দৃঢ়তা। ছোট ছোট চোখ দুটোতে শাণিত

দৃষ্টি। কানে রূপোর দুটো প্রকাণ্ড আভরণ—বাঙালি মেয়ের নরম কান হলে ছিঁড়ে নেমে পড়ত। এক লহমায় মনে হল ভুটানের স্বাধীন সৈনিকের জন্ম দেবার অধিকারিণী বীর মাতাই বটে।

কিন্তু কথাটা কুলবীরের মনে ধরেছে। স্বাধীন জাত—প্রতিদিন বিদেশী শৃঙ্খলের অপমান বয়ে বেড়াতে হয় না। তা ছাড়া নিজে লড়াই করেছে—কাদা মাখা বোমা বিধ্বস্ত ট্রেঞ্চে, ফাটা শেলের ফুলঝুরিতে, রাশি রাশি বুলেটের মধ্যে, বেয়নেটের ধারালো ফলায়। সৈনিকের মর্যাদা সে বোঝে। আর তা ছাড়া মহীতোষও সৈনিক বইকি। স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে যে সেই তো সৈনিক।

কুলবীর চিন্তিত মুখে হুঁকোয় টান দিয়ে বললে, আচ্ছা, থাকো। এখন কোনো ভয় নেই—এবেলা লোকজনের আমদানি হয় না জঙ্গলে। কিন্তু বিকেলে চা-বাগান থেকে সব আসে, তাদের সামনে পড়লে বিপদ হতে পারে।

শিউকুমারী বললে, সে তোমাকে ভাবতে হবে না, বাবা, আমি ঠিক করে নেব।

মহীতোষ কৃতজ্ঞ গাঢ় চোখে একবার তাকালো শিউকুমারীর আনন্দিত উজ্জ্বল মুখের দিকে। অস্পষ্ট গলায় বললে, তোমার দয়া থাপাজী।

—না, না, দয়া আর কিসের। এসেছ, থাকো দুদিন। কুলবীর অল্প একটু হাসল, তারপর কাঠের পায়ে খটখট করে

ঘরের ভেতরে চলে গেল। আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু সংশয় কাটছে না।

থাকার অনুমতি মিলল, কিন্তু মহীতোষ ভাবতে লাগল, থাকা কি সত্যিই সম্ভব। পাহাড়ীদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর—ঝোপড়ী। দড়ির খাটিয়া। পচাইয়ের উগ্র দুর্গন্ধ। চারদিকে নীল জঙ্গল সমস্ত পৃথিবীকে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রেখে কারাগারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের প্রকাণ্ড বিক্ষুব্ধ জগৎটাতে ইতিহাসের দ্রুত আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কী যে ঘটে চলেছে তা এখান থেকে জানবার বা অনুমান করবারও উপায় নেই। একি আশ্রয়, না আন্দামানে নির্বাসন?

শিউকুমারী এগিয়ে এল। পাহাড়ী মেয়ের সহজ নিঃসংশয়তায় একখানা হাত রাখল মহীতোষের কাঁধের ওপর। বললে, বাঙালী বাবু, কি ভাবছ?

মহীতোষ অন্যমনস্কভাবে বললে, কই, কিছুই তো ভাবছি না।

—না কিছুই ভাবতে হবে না। কোনো ভয় নেই তোমার, অংরেজ এখানে তোমাকে খুঁজে পাবে না।

মহীতোষ ম্লান হাসল: ঠিক জানো তুমি?

—জানি বই কি। কিন্তু এখানে থাকতে হলে তো বসে বসে ভাবলে চলবে না। কাজ করতে হবে। চলো, জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনি।

একটা কিছু করবার সুযোগ পেয়ে যেন হালকা হয়ে গেল

অনিশ্চিত অস্বস্তির বোঝাটা। মহীতোষ উঠে দাঁড়ালো, বললে, চলো।

শালবনের পথ। নীচের দিকটা দাবানলে জ্বলে গেছে এখানে ওখানে। শাল শিশুরা আগুনে পুড়ে গিয়ে কালো কালো কতকগুলো খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। কিন্তু আগুনে পুড়েছে বলেই ওরা মরবেনা। এ হচ্ছে ওদের জীবনী-শক্তির প্রথম পরীক্ষা, ভাবীকালে বনস্পতি হওয়ার গৌরব লাভ করবার পথে প্রথম অগ্নি-অভিষেক। তিন চার বছর দাবানল ওদের ডাল-পাতা পুড়িয়ে নির্জীব করে দেবে, কিন্তু তার পরেই অগ্নি উপাসক ঋত্বিকের মতো নির্দাহন শক্তি লাভ করবে ওরা। দিনের পর দিন বড় হয়ে উঠবে—ঋজু হয়ে উঠবে—নিজেদের বিস্তীর্ণ করে দেবে, ডুয়ার্স থেকে টেরাই পর্যন্ত।

ডালে ডালে পাখী। চেনা-অচেনা, নানা জাতের, নানা রঙের। ময়ূর আর বন-মুরগীর ছুটোছুটি। চকিতের জন্যে দেখা দিয়েই বিদ্যুতের মতো মিলিয়ে যায় হরিণের পাল। এখান ওখান দিয়ে ঝোরার জল। দুপাশে সবুজ ঘন-বিন্যস্ত ঝোপ, বড় বড় ঘাস, অসংখ্য বুনো ফুলে। পায়ে পায়ে ভুঁই চাঁপার বেগুনী মঞ্জরী।

কাঠ আর শুকনো পাতা কুড়িয়ে চলেছে দুজনে। বেশ লাগছে মহীতোষের। জীবনের রূপটা যে এত বিচিত্র, এমন মনোরম একথা আগে কি কখনো কল্পনা করতে পারত মহীতোষ? কিন্তু আর নুয়ে নুয়ে খড়ি কুড়োতে পারা যায় না। পিঠটা টন টন করছে।

শিউকুমারী ডাকল, বাঙালী বাবু ?

মহীতোষ চোখ তুলে তাকালো : কী বলছ ?

—হাঁপিয়ে গেছ তুমি। এসব কাজ কি তোমাদের পোষায় ? এসো, জিরিয়ে নিই।

একটা শালগাছের গোড়ায় শুকনো পাতার স্তূপের ওপরে বসল তুজনে। নীল, ঠাণ্ডা ছায়া। খসখসে শালের পাতায় বাতাসের শিরশিরানি। ঘুঘু ডাকছে। ভূঁই চাঁপার ওপরে উড়ে বসছে নানা রঙের বুনো প্রজাপতি। গাছের ডালে ডালে বানর লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। শান্ত, সুন্দর, ঘুমন্ত অরণ্য। হিংস্র রাত্রির অবসানে জানোয়ারেরা হয়তো ঝোপ আর ঘাসবনের ভেতরে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখন।

শিউকুমারী আস্তে আস্তে বললে, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাঙালী বাবু।

মহীতোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল : না, কষ্ট আর কিসের ?

—কষ্ট নয় ? দেশ-গাঁ ছেড়ে কোথায় এসে পড়েছ। এখানে জঙ্গল, আমরা জংলা মানুষ। এ তো তোমার ভালো লাগবার কথা নয়।

মহীতোষ মৃত্নু হাসল : কিন্তু ইংরেজের জেলের চাইতে অনেক ভালো নিশ্চয়ই।

—তা সত্যিই।

শিউকুমারীর মনটা হঠাৎ ভারাতুর হয়ে উঠল। শুধু

এইটুকুই ভালো, ইংরেজের জেলের চাইতে অনেক ভালো? তার চাইতে আরো কিছু ভালো নেই কি এখানে? জঙ্গলের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়া—হাওয়ায় ঝরে-পড়া শালের ফুল। রাত্রিতে মাতাল করা বনজ্যোৎস্না। জলঢাকার কলরোল। কাঞ্চন-জঙ্ঘার সোনার মুকুট। দূরের পাহাড়ে পাথর-কাটা পথের ওপর যখন জংলা কলার পাতা হাওয়ায় কাঁপে, জানোয়ারের পায়ে লেগে গড়িয়ে-পড়া পাথরের শব্দে মনে হয় দূরবাসী পিতম ঘোড়া ছুটিয়ে অভিসারে আসছে, তখন শিউকুমারীর ইচ্ছে করে —

কিন্তু শিউকুমারীর যে ইচ্ছে করে, সে ইচ্ছে মহীতোষের নয়। শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ। ছাব্বিশে জানুয়ারী। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে রাত্রির তপস্যা। অগষ্ট আন্দোলন—ডু অর ডাই। সেই জগৎ থেকে, সেই আন্দোলিত আবর্তিত বিপুল জীবন থেকে কোথায় ছিটকে পড়ল সে? বিক্ষুব্ধ বোম্বাই—উন্মত্ত কলকাতা। পথে পথে 'বন্দে মাতরম্'। লাঠি বন্দুক, রক্ত, আইন। চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ঘুরে যায় সমস্ত। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে—সেই গর্জিত সমুদ্রের তরঙ্গে আফ্রিকার বনভূমির শিলাসৈকতের মতো জীবনের একটা অজ্ঞাত-তটে নিক্ষিপ্ত হয়েই পড়ে থাকবে সে? আকাশে যেখানে ঘূর্ণিত নক্ষত্রমালায় আর জ্বলন্ত নীহারিকায় ভাঙা-গড়ার প্রলয় চলছে, সেখান থেকে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে মৃত্যু-সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে থাকবে নিবে-যাওয়া উল্কা?

মহীতোষ বললে, দয়া করে আশ্রয় দিয়েছ তোমরা। ঋণ কী করে শোধ হবে জানি না।

—দয়ার ঋণ আমরা শোধ নিই না বাঙালী বাবু—শিউকুমারীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল : সে আমাদের নিয়ম নয়। কিন্তু চলো, বেলা উঠে গেল।

খোঁচা খেয়ে মহীতোষ আশ্চর্য হয়ে গেল। এ আকস্মিক তীক্ষ্ণতার অর্থ কি? ডুয়ার্সের জঙ্গলের মতোই জংলী মেয়ের চরিত্র বোঝবার চেষ্টা করা বৃথা।

ছোট কাঠের বোঝাটা মহীতোষ তুলে নিলে নিঃশব্দে।

শালবনের ছায়ামেদুর কবিতায় ছন্দোপতন হয়ে গেছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে বুনো হাতীর ডাক। জলঢাকার কলগর্জন ছাপিয়ে মেঘমন্দ্রের মতো সে ডাক ভেসে এল।

কক্ষভ্রষ্ট উল্‌কা। কিন্তু নিবতে চায় না—বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে অবিরাম। তবু উপায় নেই, থাকতেই হবে অন্তত ক'টা দিনের জন্যে আশ্রয় নিতেই হবে—যে পর্যন্ত অরবিন্দ ফিরে না আসে। আর মহীতোষ জানে, মনের দিক থেকে নিশ্চিতভাবেই জানে, অরবিন্দ ফিরে আসবেই। যেখানে থাক, যেমন করে থাক, তাকে খুঁজে বার করবেই। মৃত্যুর হাত এড়ানো চলে, কিন্তু অরবিন্দের চোখকে ছাড়াবার উপায় নেই। তার দুটো চোখ যেন লক্ষ লক্ষ হয়ে পৃথিবীর আকাশ বাতাস-অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

তবু দিন কাটে। খড়ি কুড়োয়, কুলবীরের গাদা বন্দুক

নিয়ে বন-মুরগী শিকার করে, হরিণের সন্ধান করে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মনে হয় এখনি হয়তো কোথা থেকে একটা ছায়ামূর্তির মতো অরবিন্দ সামনে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু অরবিন্দ আসে না। যেখান সেখান থেকে বনলক্ষ্মীর মতো দেখা দেয় শিউকুমারী। কাঁখে কলসী, ভিজে শাড়ী সুললিত দেহের খাঁজে খাঁজে ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে রয়েছে। মৃদু হেসে চোখের তীব্র চাহনি হেনে বলে, শিকার মিলল?

থমকে দাঁড়িয়ে যায় মহীতোষ। দৃষ্টিটাকে বন্দী করে ফেলে শিউকুমারীর অনিন্দ্য দেহসুষমা। মনে রঙ লাগে। নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে অবচেতনার স্বীকারোক্তি: মিলল বলেই তো মনে হচ্ছে।

শিউকুমারীর দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে যায়।—সত্যি?

—সত্যি। যেন অদৃশ্য শয়তানের শৃঙ্খলে টান লাগে, এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় মহীতোষ: অনেক খুঁজে এইবারে পাওয়া গেল বলে ভরসা হচ্ছে।

শিউকুমারী আর দাঁড়ায় না। দেহভঙ্গিমায় উন্মত্ত আলোড়ন রক্তের কণায় কণায় জাগিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। আর পরক্ষণেই যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে যায় মহীতোষের। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়, মনে হয় একান্তভাবে ব্রতচ্যুত, যোগভ্রষ্ট। শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো। ছাব্বিশে জানুয়ারীর সঙ্কল্প ভুলে গিয়ে পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে বনে বনে প্রেম করে বেড়াচ্ছে সে?

দু-হাতে মাথাটা টিপে ধরে মহীতোষ। নাঃ, আর নয়। এ কোন্ জালে দিনের পর দিন জড়িয়ে পড়ছে সে? স্বাধীনতার সৈনিক—শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের কান্নায় কন্যাকুমারী থেকে গৌরীশেখরের তুহিন্-শৃঙ্গ অবধি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একি মোহ তার! এইভাবেই কি সে তার কর্তব্য পালন করছে?

বিকেল থেকে রাত নটা পর্যন্ত পচাই-লোভী কুলি আর পাহাড়ীদের আড্ডা বসে কুলবীরের দোকানে। কাঠের পা নিয়ে কুলবীর একা সব দেখা শোনা করতে পারে না। শিউকুমারী কাজের সহায়তা করে তার। মৃদু হাসির সঙ্গে ক্রেতার দিকে এগিয়ে দেয় পচাইয়ের ভাঁড়। মনে রঙ লাগে। নেশার রঙ—শিউকুমারীর চোখের রঙ। ভুল করে খরিদ্দারেরা বেশি পয়সা দিয়ে ফেলে।

আর সেই সময়ে কুলবীরের একটা ঢোলা হাফ-প্যাণ্ট পড়ে ঘরের পেছনে একটা চৌপাইয়ের ওপরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মহীতোষ। এই সময়টা তাকে অজ্ঞাতবাস করতে হয়। কুলীরা আসে, কুলিদের সর্দার আসে, ফরেষ্ট-অফিসের দু-চারজন আধা-বাবুরও পদপাত ঘটে। ওখান থেকে হৈ চৈ শোনা যায়, হুল্লোড় শোনা যায়, দুর্বোধ্য গানের কলি শোনা যায়, উন্মত্ত হাসিতে কুলবীরের ছোট ঝোপড়ীটা যেন থর থর করে কেঁপে ওঠে। আর সব কিছুর ভিতর দিয়ে একটা তরল তীক্ষ্ণ হাসি বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে—শিউকুমারী হাসছে।

মোহ কাটাতে চায় মহীতোষ। কিন্তু মোহ কি সত্যিই কাটে? শিউকুমারী হাসছে—পাহাড়ী মেয়ে পচাই বিক্রীর খরিদ্দারদের খুশি করবার জন্যে তার অভ্যস্ত হাসি হাসছে। তাতে মহীতোষের কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু সত্যিই কি ক্ষতি নেই? তা হলে বুকের মধ্যে জ্বালা করে কেন, কেন মনে হয় শিউকুমারী তাকে ঠকাচ্ছে?

বন-জ্যোৎস্না শেষ হয়ে গেছে, এসেছে অমাবস্যা, আরণ্যক তমসা। অন্ধকারের মধ্যে মহীতোষ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে. ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে ছেঁকে ধরে তাকে। বুকের মধ্যে অসহায় কান্নার রোল ওঠে—অরবিন্দ, অরবিন্দ? এমন সময় তাকে ফেলে কোথায় চলে গেল অরবিন্দ?

নিজে চলে যাবে? এখুনি চলে যাবে এই কালো অন্ধকারে ঘেরা শালবনের ভেতর দিয়ে, বালিমাখা জলঢাকার তীক্ষ্ণধারা পার হয়ে? কিন্তু মন তাতেও উৎসাহ পায় না। কে যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছে। একা চলে যেতে ভয় করে, ভয় করে আবার কোনো একটা নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ীদের এই ছোট ঘরেই কি সে চিরতরে বাঁধা পড়ে গেল, হারিয়ে ফেলল পথ-চলার ক্ষমতা? অরবিন্দ—এ সময়ে যদি অরবিন্দ থাকত।

কুলবীরের দোকানে কলরব ক্রমশ কমে আসছে। শিউকুমারীর হাসির আওয়াজ আর শোনা যায় না। শুধু

মাঝে মাঝে ঠুন ঠুন করে মিষ্টি শব্দ ! কাঠের বাক্সের ওপর বাজিয়ে বাজিয়ে পয়সা গুণছে কুলবীর ।

হঠাৎ কেরোসিনের টেবির আলো এসে মুখে পড়ে মহীতোষের। প্রদীপ হাতে বনরাজ্যের মালবিকা। চোখে সকৌতুক দৃষ্টি : চলো বাঙালীবাবু, ঘরে চলো। ওরা পালিয়েছে ।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহীতোষ উঠে পড়ে। ঠিক প্রথম দিনটির মতোই হাত বাড়িয়ে দেয় শিউকুমারী : এসো, এসো ।

আর কিছু মনেও থাকে না। একটু আগেকার তীব্র হাসির জ্বালাটাও তেমনি করে আর কানের মধ্যে বিঁধতে থাকে না। এই মেয়েটা কি ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছে ।

দিন কাটছিল—কিন্তু আর কাটল না। জীবনের অপরিহার্য জটিলতা এসে দেখা দিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে পচাইয়ের দোকানে কাঠের কারবারী বলদেও দেখা দিলে। এক মুখ কুটিল হাসি বিস্তার করে বললে, ভালো আছো শিউ ?

শিউকুমারীর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, কুলবীর তাকালো সন্দিগ্ধ ভীত দৃষ্টিতে। সাংঘাতিক লোক বলদেও। পচাইতে তার নেশা নেই—কোনো মতলব না থাকলে এদিকে পা দিত না সে। কিন্তু কী সে মতলব ?

কুলবীর অনুমান করবার চেষ্টা করতে লাগল।

বলদেও প্রতিপত্তিশালী লোক। যেমন কূটবুদ্ধি তেমনি নির্মম। তাকে ভয় না করে এমন লোক নেই।

তবু শিউকুমারী ভয় করেনি তাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তার হাত চেপে ধরে প্রণয় নিবেদন করেছিল বলদেও। বলেছিল, যত টাকা চাস্—

কিন্তু কথাটা শেষ হয় নি। প্রকাণ্ড চড়টার বিভ্রম থেকে আত্মস্থ হয়ে বলদেও যখন মাথা তুলেছিল, তখন জলঢাকার বালিবিস্তারের ওপর একটি প্রাণীরও চিহ্ন নেই। শুধু নদীর গর্জন পরিহাসের মতো বাজছে।

টাট্টু ছুটিয়ে বলদেও চলে গিয়েছিল। কিন্তু চড়ের জ্বালাটা যে সে ভোলেনি, সহজে ভুলবেও না—একথা শিউকুমারীও জানত।

বিবর্ণ মুখে শিউকুমারী বললে, ভালোই আছি।

—হুঁ, খুব ভালো আছো বলেই মনে হচ্ছে? —আবার নির্মমভাবে বলদেও হাসল। ছোট ছোট চোখ দুটোয় ঝিকিয়ে উঠল পাহাড়ী প্রতিহিংসার সর্পিল চমক।

বলদেও নেশা করে না সহজে। কিন্তু আজ তার কী হয়েছে—ভাঁড়ের পর ভাঁড় নিঃশেষ করে চলল সে। একটা দশ টাকার নোট কুলবীরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, চালিয়ে যাও থাপাজী।

রাত বেড়ে চললো। একে একে খরিদ্দারেরা চলে গেল সবাই। কিন্তু বলদেও ওঠে না। অধৈর্য হয়ে টাট্টু ঘোড়াটা পা ঠুকছে বারে বারে, লেজের ঘা দিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। জঙ্গলের পথে বুনো জানোয়ারকে ভয় করেনা বলদেও।

অমিত শক্তিমান লোক—ভোজালির ঘায়ে বাঘ মারতে পারে।

কী একটা কাজে কুলবীর ঘরের মধ্যে ঢুকতেই বলদেও এগিয়ে এল। শিউকুমারীর চোখের ওপর রক্তাক্ত হিংস্র চোখ দুটো স্থির নিবদ্ধ করে বললে. ফেরারী আসামীকে ঘরে জায়গা দিয়েছ?

পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে গেল শিউকুমারী ঃ কে বলেছে তোমাকে?

—আমাকে ফাঁকি দেবে তুমি? মুষ্টিগত শিকারের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্ত জিঘাংসার আনন্দে বলদেও বললে, সাত সাতটা চোখ আছে আমার। কালই খবর যাবে ফাঁড়িতে। শুধু ওই বাঙালী বাবু নয়, হাতে দড়ি পড়বে তোমার, দড়ি পড়বে থাপাজীর।

শিউকুমারী আর্তনাদ করে উঠল।

বলদেও বললে, শোনো শিউ। এ খবর আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি, রেয়াৎ করতে পারি বাঙালী বাবুকেও। কিন্তু দয়া করে নয়। আজ রাতে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। যদি আসো, কোনো ঝামেলা হবে না। যদি না আসো, কাল সকলের হাতে দড়ি পড়বে।

শিউকুমারী তাকিয়ে রইল নির্বাক চোখে।

বলদেও খাপ থেকে বার করলে ঝকঝকে ভোজালিখানা, যেন উদ্দেশ্যহীনভাবেই তার ধার পরীক্ষা করলে একবার।

বললে টাকার জন্যে ভেবো না। আমাকে খুশি করতে পারো তো যা চাও তাই দেব। যুদ্ধের বাজারে কাঠের ব্যবসা করেছি জানো বোধ হয়। কিন্তু আজ রাতের কথা যেন মনে থাকে। যদি না যাও কাল সকালে যা হবে, তার জন্যে আমাকে দোষ দিও না।

বলদেও টলতে টলতে উঠে পড়ল ঘোড়ায়। সাত সেলের তীব্র একটা হান্টিং-টর্চের আলোয় অরণ্য উদ্ভাসিত করে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

কিন্তু এত ব্যাপার জানল না মহীতোষ। দড়ির খাটিয়ায় সে তখন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাইরে শালের পাতায় মর্মর তুলে বয়ে যাচ্ছে বাতাস, ঝোপড়ীর ফাঁকে ফাঁকে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। স্বপ্ন দেখছে সে। কিসের স্বপ্ন? ছাব্বিশে জানুয়ারীর নয়, নাইন্‌থ অগষ্টেরও নয়। পতাকাবাহী উন্মত্ত জনতার তরঙ্গবেগ কোথায় চাপা পড়ে গেছে বিস্মৃতির অতলতায়। জলঢাকার খরখরে বালির ওপর বন-জ্যোৎস্না। চোখে-মুখে জলের ছাট দিয়ে যে উড়ানির বাতাস দিচ্ছে, সে কি কোনো মর্মর মূর্তি? অথবা আকাশ থেকে স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে নেমে-আসা কোন আলোক-পরী?

চমকে ঘুম ভেঙে গেল! বুকের ওপরে কে যেন আছড়ে পড়েছে এসে। বড় বড় নিঃশ্বাস মুখের ওপর এসে পড়ছে —অনুভব করা যাচ্ছে তার উত্তেজিত প্রসরণশীল

হৃৎপিণ্ডের উৎক্ষেপ। কেরোসিনের টেবির আলোয় মহীতোষ দেখলে, শিউকুমারী!

—চলো, পালাই আমরা। আমাকে নিয়ে চলো তুমি।

আকস্মিক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হয়ে মহীতোষ দুহাতে পাহাড়ী মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে, কোথায় যাব?

শিউকুমারীর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, অসহ্য আবেগে থর থর করে গলা কাঁপছে তার: যেখানে তোমার খুশি।

মহীতোষ ক্রমশ আত্মস্থ হয়ে উঠছে: কিন্তু কী করে নিয়ে যাবো তোমাকে? এখান থেকে শুধু হাতে তো পালানো চলে না। পদে পদে বিপদ। সে-সব এড়াবার জন্যে টাকা দরকার। অনেক দূর দেশে তো যেতে হবে, টাকা নইলে চলবে কী করে?

টাকা! শিউকুমারী উঠে বসল: কত টাকা চাই তোমার?

—দুশো—তিনশো। তা হলে তোমাকে নিয়ে সিকিম চলে যেতে পারব, চলে যেতে পারব একেবারে গ্যাংটকে। সেই ভালো, সেখানে গিয়েই ঘর বাঁধব আমরা। যা পেছনে পড়ে আছে, পেছনেই পড়ে থাক—মহীতোষের যেন নেশা লেগেছে: নতুন করে জীবন শুরু করব আমরা।

দুশো—তিনশো। শিউকুমারী পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা? কুলবীরের বাক্স হাতড়ালে কুড়িটা টাকার বেশি একটি আধলাও পাওয়া যাবে না, একথা তার চাইতে ভালো করে আর কে জানে।

মহীতোষ লোভীর মতো তার দিকে হাত বাড়ালো।

কিন্তু সরে দাঁড়ালো শিউকুমারী। দুশো—তিনশো টাকা। বলদেও। আজ সারারাত প্রতীক্ষা করে থাকবে। চিন্তাগুলো এক সঙ্গে আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুপুঞ্জের মতো ফুটতে লাগল। মাত্র একবার। একটি রাত্রির অশুচিতা। তারপরে যে জীবন আসবে, তার পবিত্র নির্মল স্রোতে ধুয়ে যাবে সমস্ত, মুছে যাবে সমস্ত গ্লানি আর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

মহীতোষ বললে, বুকে এসো।

—টাকার জোগাড় করে আনছি—ঘর থেকে মাতালের মতো বেরিয়ে গেল শিউকুমারী। চিন্তার মধ্যে আগুন জ্বলে যাচ্ছে—যেন এক পাত্র চড়া মদ খেয়েছে সে। দুষ্ট ক্ষুধা বলদেওয়ের। এক রাত্রের জন্য তিনশো টাকা খরচ করবে, এমন বে-হিসাবী সে নয়। প্রতিশোধ নেবার জন্যে, যতদিন শিউকুমারীর যৌবন থাকবে, ততদিন তাকে দলিত মথিত করে লুটে নেবার জন্যেই বলদেওয়ের এই কৌশল। এই ফাঁদে আরো অনেকেই পড়েছে, এটা কোনো নতুন কথা নয়।

কিন্তু শিউকুমারীর পক্ষে মাত্র এক রাত্রি। সমস্ত জীবনের জন্যে একটি রাত্রির চরম গ্লানি, চূড়ান্ত অপমানকে মেনে নেবে সে? তারপর কাল, পরশু? তখন হয়তো তারা ভুটানের পাহাড় পেরিয়ে চলেছে সিকিমের দিকে। সমস্ত শিরায় শিরায় তীব্র জ্বরের জ্বালা নিয়ে ডিলিরিয়ামের রোগী যেন উঠে বসতে

চায়, ছুটে যেতে চায়, তেমনি করেই শিউকুমারী অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর বিছানার ওপরে বিহ্বল হয়ে বসে রইল মহীতোষ। তার রক্তে রক্তে একি আশ্চর্য দোলা! যেন নিশি পেয়েছে তাকে। তার নিজের অতীত—তার জীবনের সঙ্কল্প, সব মিথ্যা আর মায়া হয়ে গেছে। নতুনের আহ্বান—বহু বিচিত্র—বহু ব্যাপক অনাস্বাদিত জীবনের আহ্বান। এই পুলিশের তাড়া—এই বিব্রত বিড়ম্বিত মুহূর্তগুলো—এদের ছাড়িয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ক্ষতি কী, ক্ষতি কী নিজেকে ভাসিয়ে দিলে আশ্চর্য একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সমুদ্রে?

চাপা গলায় মহীতোষ ডাকলে, শিউ শিউ!

কিন্তু শিউ এল না, এল অরবিন্দ। সত্যিই অরবিন্দ। জঙ্গলের মধ্য থেকে উঠে এল অমানুষিক মানুষ। মহীতোষের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন বরফগলা জলের শিহরণ নেমে গেল।

মহীতোষের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে বজ্রগর্ভ কঠিন আদেশের গলায় অরবিন্দ বললে, অনেক খুঁজে তোমার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু এখানে বসে একটা পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা ছাড়াও ঢের কাজ আছে তোমার। উঠে পড়ো।

বিহ্বল ভীত গলায় প্রশ্ন এল: কোথায়?

—পঁচিশ মাইল দূরে। ভালো শেল্টার আছে, দলের লোক আছে। ওখানে থেকে শহরে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক বেশ করা চলবে। উঠে পড়ো।

—এখনি ?

—হ্যাঁ, এখনি। মুখের মধ্যে চাপা দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল অরবিন্দের। বাঁ হাতে দেখা দিলে ছোট একটা কালো রিভলভার ঃ তিন রাত পাহাড়ীদের ঘরে কাটিয়েই কি আয়েসী হয়ে গেলে নাকি ?

মহীতোষ কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ালো। রিভলবারের সংকেতটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

অরবিন্দ বললে, বাইরে বড় ঘোড়া তৈরী আছে। দুজনকেই এক ঘোড়ায় উঠতে হবে। হারি আপ্‌ !

টর্চের আলো নিবে গেল। ঝোপড়ীর মধ্যে নিঃসঙ্গ অন্ধকারে পচাইয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দূরে ঝম ঝম করে প্রচণ্ড শব্দে ভুটিয়ারা ঝাঁঝি বাজাচ্ছে—অপদেবতাকে তাড়াবার চেষ্টা করছে তারা। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে কি অপদেবতার পদধ্বনিও মিলিয়ে এল ?

চরম লাঞ্ছনা আর মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সংগ্রহ করা তিনশো টাকার নোট। শিউকুমারীর হাতের মধ্যে ঘামে ভিজছে নোটের তাড়াটা। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে সে। কালো অন্ধকার, এক হাত দূরের মানুষ চোখে দেখা যায় না। শালের পাতায় শিরশিরানি—এখানে ওখানে বন্যজন্তুর আগ্নেয়-নয়ন।

মহীতোষ—এই কালো অন্ধকারে কোথায় মহীতোষকে খুঁজে পাবে শিউকুমারী? অরণ্য তাকে গ্রাস করেছে, নিঃশেষে তলিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে। তবু অন্ধকারে শিউকুমারী খুঁজে ফিরছে। শালের চারায় পা কেটে রক্ত পড়ছে—কাঁটায় ছড়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। এত অন্ধকার—এমন দুশ্ছেদ্য তমসায় *একটুখানি আলো পাওয়া যেত!*

আলো পাওয়া গেল। একটা তীব্র থেকে তীব্রতর। পটপট করে পাতা পোড়াবার শব্দ—বন-মুরগীর ভীত কলরব চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বন-জ্যোৎস্না নয়—দাবাগ্নি!

———

সোনালী বাঘ

আগে ছিল শুধু কালো পাহাড় আর সবুজ জঙ্গল। বাঘের ডাকে নিস্তব্ধ রাত্রির আকাশ গমগম করে উঠত। ঝর্ণার পাশে হরিণের পায়ের দাগ, ভালুকের থাবা আর এখানে ওখানে মরকত মণির ছিটের মতো টকটকে তাজা রক্তের বিন্দু। চেরাপুঞ্জীর পাহাড়ে যখন ঘননীল মেঘে বর্ষণ নামত তখন এখানকার অরণ্যও তৃষ্ণার্ত ঊর্ধমুখে আকাশের দিকে অঞ্জলি বাড়িয়ে দিত। ঝর্ণার জল ঘোলা হয়ে যেত, পাথরের চাঙ্গাড় নামত, বন্যার প্রচণ্ড তোড়ে উপড়ে পড়া শালের গাছ আছড়ে পড়ত নীচের উপত্যকায়।

মানুষ থাকত অনেক দূরে। এ তো মৃত্যুর রাজত্ব। শুধু বাঘই নয়। সকালে সন্ধ্যায় লক্ষ কোটি আরণ্য মশার বিকট গুঞ্জনে বাঘের ডাক চাপা পড়ে যায়। কাচমণির মতো মনোরম আর সুন্দর ঝর্ণার জল, কিন্তু এক আঁজলা খেলেই হাড়ের মধ্যে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি ধরে। তারপরে ব্ল্যাক-ওয়াটার ফিভার।

কিন্তু অরণ্যের ধ্যান একদিন ভাঙল। এল দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর দল। চায়ের বাগান হিসাবে জায়গাটা আদর্শ।

এল শাবল, গাঁইতি আর কুড়ুল। পাহাড়ের নীচে বিরাট কলোনী বসে গেল। কাঁটা তারের বেড়া, লোহা লক্কড়, টিনের শেড, যন্ত্রপাতি, বাংলো—তিরিশ মাইল দূরে রেল ষ্টেশন পর্যন্ত কালো পীচের পথ। ম্যালেরিয়া, সাপ আর বন্য জন্তুর মুখে বহু প্রাণ বলি দিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষের জয় হল। বুভুক্ষু বাঘেরা বন্দুকের ভয়ে আজ আর নীচে নামতে সাহস করে না—ম্যালেরিয়ার মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কুইনিনে আর ইঞ্জেকশনে।

এ প্রায় চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস। আজ এখানে সোনাঝুরি চা-বাগান। যুদ্ধের বাজারে এ বাগান এবার শতকরা তিনশো টাকা ডিভিডেণ্ট দিয়েছে। মোহিনী সরকার এ বাগানের প্রবল প্রতাপান্বিত ম্যানেজার। এ পর্যন্ত ভূমিকা।

কিন্তু মাঝখানে এমন দিনও গেছে যখন দেনায় দেনায় একেবারে ডুবে যেতে বসেছিল বাগানটা। তখন যুদ্ধ দেখা দেয় নি, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তিন আনা পাইকারী দরে বিক্রী হত চায়ের পাউণ্ড। তার পরে আগুন জ্বলে উঠল ইউরোপে। তারও পরে রেঙ্গুনে বোমা পড়ল। যাদুকরের হাতে ভেলকি লাগল বন-মানুষের হাড়ে। সরকারী প্রচার পত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝকঝকে নোট ছাপা হওয়া সুরু করল, সোনাঝুরি চা বাগানে রাতারাতি দেখা দিল সোণার খনি।

সুযোগটা নিলে গুজরাটি ব্যবসায়ী কাহ্নাইয়ালাল। রেঙ্গুনের

বিরাট কারবারের মোহ কাটিয়ে তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল কোহিমার দুর্গম পথ দিয়ে। কিন্তু একেবারে নিঃস্ব হয়ে আসেনি। পেট কাপড়ে বেঁধে যে পরিমাণ কাঁচা সোণা আর ব্যাঙ্কনোট সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, তারই একটা বড় রকম অংশ জুয়া খেলার মতো ছড়িয়ে দিয়ে কাহ্নাইয়ালাল কিনলে সোনাঝুরি বাগানের বারোআনী শেয়ার।

অনুমানে ভুল হয়নি কাহ্নাইয়ালালের। স্পেকুলেশানে শেয়ার মার্কেটে সে কোনদিন ঠকেনি, আজও ঠকল না। তিন বছরে সোনাঝুরির চা-বাগান বিপুল গৌরবে ঠেলে উঠেছে। সমস্ত দেনা শোধ করে দিয়ে ঘরে এসেছে প্রচুর ডিভিডেণ্ড্। তার বারো আনা গেছে কাহ্নাইয়ালালের পকেটে ; আর বাকী চার আনা মিলেছে অন্যান্য ছোটখাটো শেয়ার হোল্ডারের ভাগে।

টাকা—টাকা—টাকা। যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্য নাকি উৎসারিত হয়ে উঠবে সহস্র ধারায়। দেশের কোটিপতিদের বিস্তৃত অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা বেরোয় খবরের কাগজে। তাই নিয়ে আন্দোলন আর আলোড়নের অবধি নেই। ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ কবে একদা ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স অব্ অ্যামেরিকা হয়ে উঠবে, তারি সোণালি স্বপ্ন শিল্প নায়কদের চোখে।

খবরের কাগজ পড়ে হাসি পায় মোহিনী সরকারের। তিনশো

টাকা ডিভিডেণ্ডের ব্যাপারে সেও নিতান্ত উপবাসী থাকেনি, চুরির বিরাট সমারোহের মাঝখানে তার অংশটাই বরং সিংহ-ভাগ। তবু খবরের কাগজে এই সুবর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলো তারও বিবেককে যেন আঘাত করে। কত ধানে কত চাল, তা'র চাইতে সেটা বেশি আর কে জানে।

ডিরেক্টারদের আবির্ভাব প্রায়ই ঘটে বাগানে। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধু। কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্‌সন ফীর আকর্ষণ না থাকলে এ সব মহৎ উদ্দেশ্য শুকিয়ে গিয়ে বহুকাল আগেই খট্‌খটে বালি বেরিয়ে যেত।

কত দৃষ্টান্ত চোখের সামনে। বাংলায় দুর্ভিক্ষ—কাপড় নেই, চাল নেই—সব নাকি যুদ্ধের দাবী মেটাবার জন্যে রাতা-রাতি ফ্রণ্টে চালান হয়ে গেছে। তা যাক—কিন্তু বাগানের জন্যে চাল-ডাল-কাপড়-জামার কম্‌তি নেই কিছু। ওয়াগন বোঝাই কয়লা যায়, চিনি যায়, কাপড় যায়। কুলিদের অভাব দূর করো, তাদের গায়ে বস্ত্র এতটুকু কমতি না হয় সেদিকে কড়া নজর দাও—এই হচ্ছে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের আদেশ।

অতএব বাগানে কোন অভাব নেই। কাগজ পত্রে সমস্ত হিসেব ঠিক আছে। ডিরেক্টারেরা কাগজ দেখেই খুশি, বেশি না ঘাঁটানোই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন তাঁরা। তবু তাঁদের একজন কি ভেবে বলে বসলেন, চলুন, বাগান দেখা যাক। একটা ঢোঁক গিলে মোহিনী বললে, চলুন।

বাগানের ভেতর কালো কালো কুলি মেয়েরা কাজ করছে। অদ্ভুত ক্ষিপ্র গতিতে হাত চলছে তাদের, পিঠের ঝুড়িটা ভরে উঠছে সবুজ সরস চায়ের পাতায়। কিন্তু ওরা সামনে এগিয়ে আসতেই তারা টুপটুপ করে চা-গাছের আড়ালে বসে পড়ল। যেন কী মন্ত্র বলে এতগুলো মাথা এক সঙ্গে অদৃশ্য।

ডিরেক্টার বললেন, ওরা ওভাবে লুকালো কেন বলুন তো?

মোহিনী ঠোঁট দুটো চেটে বললে, ওদের পরণে যে কাপড় আছে, তাতে শরীরের সবটা ঢাকে না বলেই—

বিস্মিত ডিরেক্টার বললেন, কেন এত কাপড় এলো বাগানে?

—মানে, ইয়ে বুঝলেন না, যা ডিম্যাণ্ড তার অর্ধেকও—

ডিরেক্টার একবার তীক্ষ্ণ চোখে মোহিনীর দিকে তাকালেন। চোখা-চোখি হল ক্ষণিকের জন্যে এবং তারই মধ্যে প্রচুর ভাব বিনিময় হয়ে গেল।

—তাই কী? হবে।

খানিকটা এগোতেই কুলি বস্তি। খুব খানিকটা হাঁউ মাউ কান্না শোনা গেল সেখান থেকে। মড়াকান্নার একটানা দীর্ঘস্বর।

—কেউ মরেছে নাকি?

—হ্যাঁ, একটা কুলি।

—কী হয়েছিল জানেন?

মোহিনী নিরুত্তর। উত্তরটা তার সর্বাঙ্গ ঘিরে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ রাশি রাশি চাল এসেছে বাগানে,এসেছে খাদ্য।

—ডাক্তার বলেছে ম্যালনিউট্রিসন।

ডিরেক্টার ঠোঁট কামড়ালেন। বললেন, ওর বউটাকে একবার ডাকতে পারেন ?

—ডাকলেও আসবেনা।

—কেন ?

আবার দৃষ্টি বিনিময়। অনাহারে মরবে, তবু লজ্জা ছাড়তে পারবেনা। স্বামীর মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে কান্না জুড়েছে ভাঙা গলায়, কিন্তু নগ্ন দেহে বেরিয়ে আসবে কেমন করে ?

ডিরেক্টার খানিক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর ফেরবার পথে বললেন, কাপড় চোপড় কিছুই নেই একেবারে ?

—না। গুদামে গিয়ে একবার দেখুন না স্যার। গাঁট বাঁধবার কতগুলো ছেঁড়া টুকরো ছাড়া—

—বেশ, বেশ। ওই টুকরোগুলোই যা পারেন বিলিয়ে দেবেন ওদের। তবু তো হবে কিছুটা।—একটা মহৎ কাজ করতে পারায় ডিরেক্টারের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বিবেককে নিরঙ্কুশ করে ফেলেছেন তিনি।

এইতো সত্যিকারের অবস্থা। মৃদু হেসে মোহিনী খবরের কাগজটা নামিয়ে রাখল। শিল্পপতিদের বোম্বাই পরিকল্পনা ! দেশটা সত্যি সত্যিই আমেরিকা হয়ে যাবে !

সামনে প্যাকিং বাক্সের একটা হিসাব। দশহাজার বাক্স এসেছে বাগানে। সত্যিই কি দশহাজার! কাগজের অঙ্ক বাদ নিলে গোণা গুন্‌তি দাঁড়াবে সাত হাজারে। বাকী তিন হাজার যে কোথায় যায়, কলকাতায় নানা কাজ কারবারে ব্যস্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টার কাহ্নাইয়ালালের সেটা জানবার কথা নয়।

রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল মোহিনী সরকারের স্ত্রী অমলা। অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কিছুদিন আগেও নাকে নোলক পরত। হালে তার পদোন্নতি হয়েছে। অমলা আজকাল সারাদিন চা খায়, তেলে ভাজা জিলিপীর চাইতে প্লাম কেকে তার রুচি বেশি। কোকো ভালবাসে, তবে কফির কেমন একটা পোড়াগন্ধ তেমন পছন্দ করতে পারে না। পুরু পাউডারের প্রলেপে নাকের ছিদ্রটা প্রায় অদৃশ্য হতে বসেছে।

খট্ খট্ শব্দ করতে করতে এল অমলা। একটা উদ্ধত ভঙ্গিকে আবর্তিত করে তোলবার চেষ্টা করলে সর্বাঙ্গে।

—সারাদিন কি একরাশ রাবিশ নিয়ে বসে আছ। একটু বেড়াতে বেরোবে না ?

চোখ তুলে মোহিনী একবার তাকালো অমলার দিকে। বেশ তৈরী হয়ে উঠেছে, আর দুবছরের মধ্যে কোথাও একটু ফাঁক খুঁজে পাওয়া যাবে না। রঙীন কাপড় দিয়ে পুতুল সাজিয়ে ছেলেমেয়েরা যেমন সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করে অমলা সম্বন্ধে মোহিনীর মনোভাবটাও সেই জাতীয়।

—নাঃ, আজ আর বেরোনা চলবে না। এরোড্রেমের ওরা সন্ধ্যায় চা খেতে আসবে, সব ঠিক করে রাখতে বলো গে।

—মাই গড! অমলা বললে, এতক্ষণ বলোনি!—দ্রুত পদক্ষেপে হিলের জুতো প্রস্থান করলে।

আরো খানিকক্ষণ কাজ কর্ম করবার পরে মোহিনী কাগজ পত্র গুলোকে রাখল সরিয়ে। বেলা পড়ে আসছে। সোনাঝুরি চা-বাগানের দেবদারু গাছগুলোর মাথা রাঙিয়ে দিয়ে সোনার রঙ পিছলে পড়ছে সবুজ পাতার সমুদ্রে। সেই রঙের দীপ্তি দেখা যাচ্ছে কালো কালো কুলি মেয়েদের মুখে। চায়ের পাতাগুলো যেখানে পেষা হচ্ছে ওখান থেকে আসছে নিরবচ্ছিন্ন লোহার কলরব। পাহাড় আর অরণ্য দিনান্তের সোনা মেখে রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করছে, অন্ধকার নেমে এলেই জেগে উঠবে ওখানকার হিংস্র জীবন। ঝর্ণার জলে সোনা, সোনাঝুরি চা বাগানে সোনা ফলছে।

মাথার ওপরে এরোপ্লেনের পাখার শব্দ। মাইল তিনেক দূরে মাঝারী গোছের একটা এরোড্রোম বসেছে, পূর্ব সীমান্তে প্রতিরোধ ব্যবস্থা। শালগাছের উদ্ধত মাথাগুলোর ওপরে যেন পাখার ঝাপটা দিয়ে গেল।

মন দিয়ে মোহিনী অপস্রিয়মান যন্ত্র ঈগলটাকে লক্ষ্য করতে লাগল। পাখার গায়ে তিনটে নানা রঙের সমুজ্জ্বল বৃত্ত। উদীয়মান সূর্যকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে অভিযান করেছে। চলুক,

চলুক, যুদ্ধ চলুক। শুধু বোমারই বুম নয়, ব্যবসায় বুম, চায়ের রাজারে বুম। যুদ্ধ দেবতার কুঠার মানুষকে হত্যা করে, কিন্তু তার ফলাটা সোনায় তৈরী।

ঝাড়নের একটা শব্দ অত্যন্ত প্রকট হয়ে কানে এল। যত-টুকু প্রয়োজন তার চাইতে অনেক বেশি, যেন মোহিনীর মনোযোগটা আকর্ষণ করতে চায়। বারান্দা ঝাঁট দিতে ঝি এসে উপস্থিত হয়েছে। অমলা সংশোধন করে বলে, আয়া।

চোখ কাণ তীক্ষ্ণ করে আয়া অনুভব করে নিলে অমলা কোথায় এবং কতদূরে। তারপর মোহিনীর টেবিলের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

আয়ার চুল থেকে সৌখীন তেলের গন্ধ মুহূর্তে জাগিয়ে দিলে মোহিনীকে। মোহিনী সোজা ওর দিকে তাকালো, চোখের দৃষ্টি উঠল ঘন আর গভীর হয়ে। কে বলে সাঁওতাল মেয়েরা কালো এবং কুশ্রী? প্রসাধনের মায়াস্পর্শে আয়াকে এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মনে হয়।

স্বপ্নাবিষ্টের মতো মোহিনী হাসল: কী চাই?

—কিছু না।—একটা আকস্মিক ঝাপটা দিয়ে সরে গেল মেয়েটা। এ শুধু খেলা—তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্যে একটুখানি লঘু কোতুক।

নিরাপদ সীমানায় দাঁড়িয়ে আয়া মারাত্মক একটা ভ্রূভঙ্গি করলে। চমক লাগল মোহিনীর চেতনায়। কিন্তু এখন সময়

নয়। বাইরে দিনের আলো, সোনাঝুরি চা-বাগানের ওপর অস্ত যাচ্ছে সোনার সূর্য। যখন তখন এসে পড়তে পারে অমলা।

—আমাকে একটা গাউন কিনে দিতে হবে বাবু।

—গাউন ?

—হুঁ। ওই যে মেম সায়েবেরা পরে।

—বটে !—মোহিনী বিস্ময় বোধ করলে : মেমসায়েব হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে নাকি ?

—হুঁ।—আয়া সশব্দ হাসি হাসল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটী তির্যক দৃষ্টি। এটা অধিকন্তু—অনুরোধটা জোরালো হবে এতে।

—আচ্ছা যা, দেখা যাবে।

আশ্চর্য লাগছে মোহিনীর। মানভূমের কোন এক শাল বনের ছায়া আর লাল মাটির টিলা থেকে আমদানী হয়েছিল এই কালোকোলো হাবা মেয়েটা। ওর স্বাস্থ্যসুঠাম শরীর মোহিনীকে আকর্ষণ করেছিল, তাই বাগান থেকে তুলে এনে সোজা নিজের কাজে লাগিয়েছিল। এই ক' বছরেই কী দ্রুত প্রগতি হয়েছে ! আর শুধু ওরই বা দোষ কী। অমলাও তো ঠিক তালে তালেই এগিয়ে চলেছে।

ক্রিং করে লাল সাইকেলের ঘন্টির শব্দ। টেলিগ্রাম। ক্ষিপ্র হাতে লেফাপা ছিঁড়ে টেলিগ্রাম পড়ল মোহিনী।

কাল সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতা থেকে আসছে শঙ্করলাল, কাহ্নাইয়ালালের ভাইপো।

ধড়মড় করে করে উঠে পড়ল সে। সকলকে এখনি ডাকা দরকার। কাগজপত্র, গুদাম সমস্তই রাতারাতি ঠিক করতে হবে হবে। আর যে তিনশো বস্তা অতিরিক্ত চা গুদামে মজুত আছে, তাদেরও নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে এক্ষুনি। খাতাপত্রে ওই তিনশো বস্তার হিসেব নেই কিছু।

সন্ধ্যায় বাংলোতে ফিরে মোহিনী দেখলে অনুষ্ঠানের ত্রুটী নেই কোথাও। আতিথেয়তার ব্যাপারে অমলা তাকে অনেক পেছনে ফেলে গেছে আজকাল। বেতের চেয়ারে, টেবিলে আর ফুলদানীতে সুন্দর করে সাজিয়েছে বারান্দাকে। আর এমন ভাবেই প্রসাধন করেছে যে দেড় মাইল দূর থেকেই তার কস্‌মেটিকের গন্ধ যেন মাথা ঘুরিয়ে দেয়। গলার খাঁজে পুরু পাউডারের আস্তর দিয়ে সেটাকে একেবারে সাদা করে ফেলবার একটা মর্মান্তিক দুশ্চেষ্টা করেছে অমলা।

অমলা বললে, নন্‌সেন্স। এত দেরী করলে। ওদের যে আসবার সময় হয়ে গেল।

ক্লান্ত গলায় মোহিনী বললে, তুমি একাই তো যথেষ্ট।

ভ্রূ কুঁচকে অমলা বললে, মানে ?

—মানে কিছু নেই—মোহিনী মন্থর অবসন্ন গতিতে ভেতরে

চলে গেল। কেন কে জানে, আজকে অমলার এই অতি প্রসাধনটা তার ভালো লাগলো না। মোহিনীর হাতের তৈরী পুতুলটা কার মায়াবলে জীবন্ত হয়ে উঠল? তার সৃষ্টি যেন তাকেই ছাড়িয়ে যেতে চায়। বড় বেশি এগিয়ে গেছে অমলা— এখন একবার রাশ টানা দরকার।

বাথরুমের সামনে অনুজ্জ্বল নীল আলোতে দেখা গেল আয়াকে। মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। মোহিনীকে দেখে মুহূর্তে সিগারেটশুদ্ধ হাতটাকে পেছনে লুকিয়ে ফেললে।

—কিরে, গাউন পরবার আগেই সিগারেট ধরেছিস?

আয়া অপ্রতিভ হয়ে গেল অনেকটা। বললে, না, ওরা দিলে তাই—

—কারা দিলে?

—ওই—উত্তরটা অসমাপ্ত রেখেই আয়া দ্রুত প্রস্থান করলে।

মোহিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিক্ষণ।

সমস্ত চিন্তা চকিত আর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আজ সন্ধ্যায় সব কিছু বিরক্ত আর বিস্বাদ করে দিচ্ছে মনকে। অমলা আর আর আয়া দুজনেই বড় বেশী এগিয়ে গেছে, এত বেশী এগিয়েছে যে মোহিনী যেন আর তাদের নাগাল পাচ্ছে না। হয়তো এমন দিনও আসবে যখন দূর থেকে অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করবার থাকবে না মোহিনীর। নিজের

তৈরী অস্ত্র আজ কি তার নিজের বুক লক্ষ্য করেই উদ্যত হয়ে উঠল ?

হঠাৎ নিস্তব্ধ রাত্রির আকাশে গম গম করে বাঘ ডেকে উঠল। পাহাড়ে বাঘ ডাকছে। ক্ষুধিত বাঘ আজ আর স্বচ্ছন্দে নীচে নেমে আসতে পারে না—মানুষের ভয়ে, তার অস্ত্রের ভয়ে। তাই দুর্গম পাহাড়ের জটিল লতাগুল্মের আড়ালে গর্জন করে অসহায় আক্রোশে। ক্বচিৎ কখনো দু একবার নেমেও এসেছে, প্রাণ নিয়েছে মানুষের, তার পরে নিজের প্রাণ দিয়েছে। সোনাঝুরি চা-বাগানে সোনার শস্য দেখা দিয়েছে, প্রাচুর্যের সঞ্চয় মানুষের বিশ্বব্যাপী মুষ্টির ভেতর থেকে উপচে পড়ে যাচ্ছে, শুধু বাঘই বঞ্চিত। এই গর্জনের ভেতর দিয়ে সে কি নিজের দাবীকেই জানাতে চায় ?

বাইরে জীপগাড়ি থামবার শব্দ। অমলার কলকণ্ঠ, পুরুষের মোটা গলা। এরোড্রোমের আমন্ত্রিতেরা এসে পড়েছে।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে অনিচ্ছুক দেহ আর আড়ষ্ট মন নিয়ে মোহিনী বেরিয়ে এল বাইরের বারান্দাতে। আসর ভালো করেই জমে উঠেছে, তার অভাবে কোনখানে এতটুকু ত্রুটি নেই কিছুর। এরোড্রোমের দুজন ভারতীয় কর্মচারী এসে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন—একজন সিন্ধী আর একজন পাঞ্জাবী। সিগারের কড়া গন্ধ বাতাসকে ঘনীভূত করে তুলেছে। শুধু

সিগারের গন্ধই নয়, মোহিনীর অভ্যস্ত নাক তার ভেতরে মদের অস্তিত্বও অনুভব করল।

মোহিনীকে দেখবামাত্র খানিকটা অট্টহাসি বিদীর্ণ হয়ে পড়ল।

—দ্য ম্যানেজার ইজ অল্‌ওয়েজ লেট।

—ও, হি ইজ এ লেট লতিফ।

—নট লতিফ বাট সিরকার।

—আবার খানিকটা উচ্ছ্বসিত হাসি। পাঞ্জাবী আর সিন্ধীর চোখের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় প্রকৃতিস্থ নেই ওরা। হাসির ধমকে পাঞ্জাবীর প্রকাণ্ড শরীরটা দুলে উঠছে ঢেউয়ের মতো। সিন্ধীর বাহুমূলে অভিজাত ইউনিফর্মের ওপরে জ্বলজ্বল করছে সোনালি ঈগল। তাদের অত্যন্ত কাছ ঘেঁষে বসেছে অমলা। কী বুঝেছে কে জানে, তারও সমস্ত মুখ নির্বোধ হাসিতে উদ্ভাসিত। পাঞ্জাবীর অনামিকায় জ্বলছে একটা হীরের আংটি। ওদের নেশার ছোঁয়াচ যেন রঙ ধরিয়েছে অমলার গালে, অমলার মনেও। পাঞ্জাবীর চেয়ারের হাতল ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে আয়া—সেও হাসছে। পলকের জন্যে একবার অমলা, আর একবার আয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল মোহিনী। কী একটা জিনিষ মুহূর্তের মধ্যে ওর মনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, এরা দুজনে যেন আজ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে মোহিনী চেয়ারে বসে পড়ল। চায়ের সঙ্গে চলতে লাগল উদ্দাম হাসি, অকারণ কৌতুক, সুলভ রসিকতা। অমলা যেন রাতারাতি বিলাতী ছবির নায়িকা হয়ে উঠেছে। আয়ার চোখেও যেন তারি প্রতিবিম্ব।

মোহিনীর অস্বস্তি লাগতে লাগল, অতি তীব্র অস্বস্তিতে জ্বালা করতে লাগল সমস্ত শরীরটা। এখানে সে অনধিকারী, তার উপস্থিতিতে যেন এখানকার উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্যে ছন্দোপতন ঘটে যাচ্ছে। এখান থেকে এখন তার সরে যাওয়াই উচিত। মোহিনী হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো। রাত নটা বাজে। অফিসের কাগজ পত্র এলোমেলো, গুদামের বাড়তি তিনশো বস্তা রিমুভ করবার কোনো বন্দোবস্ত এখনো হয়নি। ওদিকে কাল সন্ধ্যার ট্রেণেই শঙ্করলাল এসে পড়বে। বোম্বাইয়ের পাকা ব্যবসাদার লোক, আর যাই চলুক, ফাঁকি চলবে না।

মোহিনী উঠে দাঁড়ালো।—একস্‌কিউজ মি, অফিসে জরুরি কাজ পড়ে আছে, আমাকে এখুনি উঠতে হবে।

—দ্য স্কাউণ্ড্রেল সিরকার ইজ অল্‌ওয়েজ বিজি।

—লেট হিম গো।

—উই হ্যাভ গট আওয়ার বিউটি—পাঞ্জাবী জিভ কাটলে: আওয়ার সুইট হোস্‌টেস।

মুখ লাল করে মোহিনী উঠে পড়ল। চা বাগানের ম্যানেজার

—ছোটখাট জিনিসকে গায়ে মাখলে বহুদিন আগেই এ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বানপ্রস্থ নিতে হত তাকে। কিন্তু এখানকার এই আবহাওয়া মোহিনীর পক্ষেও অসহ্য হয়ে উঠছে, নিজেকে বড় বেশি অপমানিত বলে বোধ হচ্ছে। আয়া আর অমলার চোখে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহ্নিচ্ছটা, ছলনাতে কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে তারই প্রতিযোগিতা চলছে যেন। মোহিনীর সৃষ্টি আজ মোহিনীকে অতিক্রম করে যাওয়ার দাবী রাখে।

জোর কোরেই ওখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে সে, দ্রুত পায়ে বাংলোর লন পেরিয়ে চলল এগিয়ে। যা করে করুক ওরা। এখনি অফিসে গিয়ে বসতে হবে স্তূপাকার কাগজ পত্র নিয়ে। কাল সন্ধ্যায় শঙ্করলাল আসবার আগেই সমস্ত ছিদ্রগুলোকে বেমালুম জুড়ে দিতে হবে।

বাংলোর বারান্দা থেকে আসছে উচ্ছ্বসিত হাসি আর দূরে পাহাড়ের কোলে বাঘের ডাক। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনল মোহিনী। ওই দুটো শব্দ এক সঙ্গে মিলে গিয়ে যেন একটা ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়েছে। ওদের মধ্যে কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে কি ?

চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে অফিসে এসে ঢুকল। কাজ চলছে পুরোদমে। ঠেলাগাড়িতে করে বস্তাগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটা ফাইল টেনে নিয়ে মোহিনী কাজের মধ্যে ডুবে গেল। ঘড়ির কাঁটায় ঘুরতে লাগল সময়।

নিস্তব্ধ রাত। প্রায় বারোটা! শুধু টেবিল ফ্যানটা ঘুরছে কট্‌ কট্‌ করে—মোহিনী খস খস করে উল্‌টে চলেছে ফ্ল্যাট ফাইলের শীট্‌গুলো। হঠাৎ একটা উচ্চণ্ড আর উদ্দাম চীৎকারে রাতের পৃথিবী উঠল জেগে। কুলি বস্তিতে দারুণ কোলাহল—মর্মান্তিক আর্তনাদ।

মোহিনী চমকে দাঁড়িয়ে উঠল।

—কী হয়েছে? আগুন লাগল নাকি?

প্রবল চীৎকার। ভয়ার্ত কলরব। ঢন ঢন করে ঘা পড়ছে ক্যানেস্তারায়। পাঁচ সাতটা গলার উতরোল কান্না।

একজন কেরাণী বললে, আগুন নয়। নিশ্চয় কোনো জানোয়ার নেমেছে পাহাড় থেকে!

সঙ্গে সঙ্গেই দশ বারোজন লোক খোলা দরজার পথে এসে আছড়ে পড়ল মোহিনীর পায়ে। হাঁউমাউ করতে করতে বললে, হুজুর বাঘ এসেছিল বস্তিতে।

—বাঘ?

—হাঁ হুজুর। মংরুকে খাটিয়া থেকে তুলে নিয়ে গেল।

মোহিনীর শিরাস্নায়ুর মধ্যে উত্তেজিত হয়ে উঠল শক্তি আর তেজের তরঙ্গ। গায়ের কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে চেয়ারের ওপর। বললে, যতগুলো পারিস মশাল জ্বালিয়ে দে চারদিকে। আমি বন্দুক নিয়ে আসি।

ক্ষিপ্রগতিতে মোহিনী এগিয়ে গেল বাংলোর দিকে।

লোহার গেটটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো বারান্দাতে। দুটো ঘরের দরজাই বন্ধ। অমলার ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাতেও কি ঘুমোয়নি অমলা!

দরজায় ঘা দিতে গিয়েই খড় খড়ির ফাঁকে যা চোখে পড়ল তা মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ করে দিলে মোহিনীকে। অসম্ভব বা অস্বাভাবিক হয়তো নয়, কিন্তু এতখানির জন্যে সে তৈরী ছিল না। এ ঘরের মালিক এখন সে নয়—তার জায়গা দখল করেছে সিন্ধী!

রাগ নয়, দুঃখ নয়, স্ত্রীর এই রূপ দেখে উগ্র হিংস্রতার চিরন্তন প্রেরণাতেও শরীর জ্বালা করে উঠলনা। মোহিনী শুধু অভিভূতের মতো তাকিয়ে রইল। কেন সে এসেছিল, কোথায় এসে সে দাঁড়িয়েছে, কয়েক মুহূর্ত কিছুই আর মনে পড়ল না। সব যেন শূন্য আর মিথ্যে হয়ে গেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মোহিনী পাশের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। এ ঘরও বন্ধ, ভেতর থেকে পাঞ্জাবীর গলার আওয়াজ। তবে এ ঘরে আলো জ্বলছে না, অমলার চাইতে আয়ার লজ্জাটা কিছু বেশি—গৃহিণীর মতো অতটা সে এগিয়ে যেতে পারেনি। তবে তারও দিন আসছে।

নিজের ঘরেই ঢোকবার অধিকার আজ আর নেই মোহিনীর। নিঃশব্দে পা টিপে সরে এল সে, একটু জুতোর শব্দ না হয় এতটুকু রসভঙ্গ না হয় কোনোখানে। বারান্দার

রেলিং মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরে ঝুঁকে দাঁড়াল সে। শনশন করে হাওয়া দিচ্ছে; শরীরটা মৃদু শীতের স্পর্শে উঠছে শিউরে। বাংলোর টালী দেওয়া ছাতের ওপর টুপটুপ করে পড়ছে রাত্রির শিশির। পাহাড়ের গায়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কালো অরণ্য। নীল লাল আলোর ছুটো সরু রেখা অন্ধকার আকাশের গায়ে বুলিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে।

ওদিকে কুলি বস্তিতে কোলাহলের বিরাম নেই। অনেকগুলো মশালের আলো, ক্যানেস্তারার শব্দ, নারীকণ্ঠের কান্না—মংরুর স্ত্রীই নিশ্চয়। পাহাড়ের রাজত্ব থেকে ক্ষুধার্ত বাঘ হানা দিয়েছে ওখানে। বাঘ—সোনাঝুরি বাগানের সোণালি বাঘ।

যুদ্ধ দেবতার কুঠার সোণায় তৈরী। কিন্তু কুঠার তো চিরদিনই কুঠার—সে শুধু হত্যাই করে!

মৃত্যুবাণ

গুনিনের ওপর শীতলার ভর হল। গাঁয়ের বারোয়ারী অশথ তলা। তার নীচে পুরানো বেদীটা প্রদীপের তেল আর মেটে সিঁদুরে একটা বিচিত্র রঙ ধরেছে। নীল শ্যাওলার ওপর দিয়ে কালো পোড়া তেল ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে—একপাশে থকথকে সিঁদুর জমেছে চাপ বাঁধা রক্তের মতো। ধূনোর গন্ধে যেন নিশ্বাস আটকে আসে।

বেদীর ওপরে একখানা কালো পাথর—তার সারা গায়ে ব্রণের চিহ্ন। মারী জননীর প্রতীক। মাঝখান দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ফাটল—দেখলে মনে হয় কেউ যেন সেটাকে দুটুকরো করে কেটে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। পৌত্তলিকতাদ্বেষী রাঢ়জয়ী মুসলমানেরই তলোয়ারের কোপ পড়েছিল কিনা কে জানে।

ফাল্গুনের রৌদ্রে উদ্ভাসিত এই ভরা দুপুরেও অশথের বিস্তীর্ণ শান্ত ছায়ার নীচে ঘনিয়েছে উগ্রগন্ধী অন্ধকার। ধুনো পুড়ছে—গুগ্‌গুল পুড়ছে। পট পট করে শব্দ হচ্ছে—কালো ধোঁয়া চক্রাকারে উঠছে সাপের কুণ্ডলীর মতো। ঢাকের গগনভেদী বোল বোল উঠছে—ক্যান্ ক্যান্ করে তীক্ষ্ণ পেত্নীর কান্নার

মতো স্বর তুলছে কাঁসর। আর তার ভেতরে বসে গুনিন একটানাস্বরে মন্ত্রপাঠ করে যাচ্ছে। তার কতকটা সংস্কৃত, কতকটা বাঙ্গলা, কতকটা দুর্বোধ্য ড় আর ঢ়-এর সমারোহ। অশুদ্ধ উচ্চারণে জোর দিয়ে বলে যাচ্ছে ঃ হাড় কট্টন, মাংস চর্বণ—

চারদিকে মেয়ে-পুরুষের ছোট একটা দল জমেছে। গলায় আঁচল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ, কেউবা তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টিতে। ঢোল আর কাঁসরের বিরামযতিতে সেই গম্ভীর মন্ত্রনাদটা যেন অলৌকিক হয়ে উঠছে। ধুনোর ধোঁয়ায় যাদের মাথা ঘুরছে, চোখে যারা দেখছে অন্ধকার, তাদের যেন মনে হচ্ছে এই কালো পাথরটা হঠাৎ একসারি ধারালো দাঁতশুদ্ধ কালো একখানা রক্তাক্ত মুখ মেলে দেবে, আর কড়মড় করে হাড় মাংস চিবোতে স্বুরু করে দেবে !

—হেই গুনিন, ভালো করে মন্তর পড় বাবা। মার অনুগ্রহ একটু না কমলে যে আর বাঁচি না।

জনতার মধ্য থেকে কার যেন সকাতর অনুনয়। গুনিন একবার পেছন ফিরে তাকালো। মদের নেশায় আর ধুনোর আগুনে চোখ দুটো রাক্ষসের মতো টকটক করছে। প্রকাণ্ড একটা গোলাকার মুখ—খাড়া খাড়া চোয়াল। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোয় কপালের আদ্ধেকটা ঢাকা পড়েছে।

যেমন করে ম্যালেরিয়ার ঝাঁকুনি আসে, তেমনি থরথর

করে একটা কাঁপন এসে যেন গুনিনের আপাদ-মস্তক ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল। দুহাতে দুটো ধুনুচী নিয়ে উঠে দাঁড়ালো গুনিন—সমস্ত শরীর তার টলছে। তারপরে সুরু হল তাণ্ডব নাচ।

গুনিনের ওপরে শীতলার ভর হয়েছে। মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ করে বেরুচ্ছে একটা বীভৎস চাপা আওয়াজ। কখনো মাটিতে আছড়ে পড়ছে—পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে নেচে চলেছে রুদ্রতালে। ঝাঁকড়া চুলগুলো থেকে ধুলোর ঝড় উড়ছে। ফটাস করে একটা ধুনুচী মাটিতে পড়ে দুখান হয়ে গেল···চারদিকে ছিটকে গেল আগুন। 'সর সর' করে লোক পালিয়ে যেতে পথ পেল না।

গুনিন আবার উঠেছে—আবার নাচ সুরু করেছে। কিন্তু নাচের তালে কেন যেন ভাঁটা পড়েছে এবার। পা আর তেমনভাবে চলছে না। মুখ থেকে চাপা গোঙানির শব্দটা কেমন বিকৃত আর অস্বাভাবিক বোধ হচ্ছে। জ্বলন্ত চোখ দুটো যেন ঝিমিয়ে আসছে ক্রমশ

এবারে গুনিন থেমে দাঁড়ালো। টলমল করে কাঁপতে লাগল তার সর্বশরীর। তারপর ঠিক ইচ্ছে করে নয়—পেছন থেকে কে যেন মস্ত একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে ঘাড় মুচড়ে ফেলে দিলে মাটিতে। চারপাশের জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে—যা হওয়া উচিত এ তো তা নয়। বিস্ফারিত ভয়ার্তচোখে গুনিন কিছুক্ষণ গোঁ গোঁ করতে লাগল,

কষ দিয়ে ফেনার সঙ্গে বেরিয়ে এল একঝলক রক্ত। বলি দেওয়া পশুর মতো বার কয়েক হাত পা ছুঁড়েই সে সটান শক্ত হয়ে গেল। সমস্ত শরীরের ঢেউয়ের মতো দোলা দিয়ে বেরিয়ে এল অন্তিম একটা দীর্ঘশ্বাস—নাকের সামনে থেকে খানিকটা ধুলো উড়ে গেল হাওয়ায়।

হৈ হৈ করে ছুটে এল জনতা। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। মরে পাথর হয়ে গেছে গুনিন।

ঢাকের বোল থেমে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল কাঁসরের আর্তনাদ। স্তম্ভিত জনতা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, নিদারুণ ভয়ে একটি কথাও কেউ বলতে পারলে না।

একজন বললে, নিশ্চয় অশুচি হয়ে পূজোয় বসেছিল, তাই—

ধুনোর অন্ধকারে ব্রণ-চিহ্নিত শীতলার পাথরটা গাঢ় রক্তের মতো খানিক সিঁদুর মেখে ক্ষুধার্ত হয়ে তাকিয়ে আছে। অশথের পাতায় শাঁ শাঁ একটা উদাস বাতাস বয়ে গেল। যেন একটা অশরীরী কণ্ঠ চাপা গর্জন করে বলে গেল: এবার তোদের পালা, গুনিনের মতো তোরাও—

মুহূর্তে বারোয়ারীতলা জনশূন্য। প্রাণ নিয়ে উর্ধশ্বাসে পালিয়েছে সকলে। শুধু অসমাপ্ত পূজোর উপকরণের সামনে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল গুনিনের দেহটা। মুখের পাশে রক্তের চাপ ক্রমে ঘন হয়ে উঠতে লাগল—ধূপ আর গুগ্ গুলের

ধোঁয়া একটা কালো পর্দার মতো নিবিড় হয়ে নামতে লাগল তার চারপাশে।

গুনিনের আসল নাম অভিরাম দাস—জাতিতে চণ্ডাল।

এই জাতিটা নাকি বর্ণসঙ্করের কঠিনতম শাস্তির প্রতীক। প্রতিলোম বিবাহকে ক্ষমা করবে না ব্রাহ্মণ-চালিত সমাজ, ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে অব্রাহ্মণকে পতিরূপে বরণ করলে তাদের সন্তান হবে অন্ত্যজ। সমাজের সমস্ত পথ তার কাছে বন্ধ হয়ে যাবে। তাকে শ্মশানে বাস করতে হবে, অখাদ্য আহার করতে হবে, মড়ার কাপড় নিয়ে লজ্জা নিবারণ করতে হবে। তাদের ছায়া মাড়ালে খণ্ডে যাবে—ক্ষয়ে যাবে সতেরোবার বিশ্বনাথ দর্শনের পুণ্য।

আজকাল অবশ্য অন্ত্যজ মাত্রেই শ্মশানের বাসিন্দা নয়। কিছু কিছু পদোন্নতি যে হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী। এখন তারা ভদ্রপাড়ার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে কিছুটা। শূয়োর চরায়, ডালা কুলো ধুচুনি তৈরী করে, ভদ্রসমাজের দৈনন্দিনের পক্ষে সেগুলো অপরিহার্য। কেউ কেউ ক্ষেত করে, তরি-তরকারী লাগায়, বিক্রী করে বাজারে। দু'একটা ভালো ফল-ফুলুরি উপহার দিলে ন্যায়রত্ন স্মৃতিরত্নেরা খুশি মনেই সেগুলো গ্রহণ করে থাকেন, অবশ্য নেবার সময় কিছু কিছু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হয় তাতে। কিন্তু এছাড়াও আর একটা দিক

আছে এদের। সেজন্যে ইতর ভদ্র নির্বিচারে ভয় করে এদের—শ্রদ্ধা করে। এরা মন্ত্রসিদ্ধ।

অভিরামের বাপ নিধিরাম ছিল এ তল্লাটের সেরা গুনিন। না জানত এমন মন্ত্র নেই, না পারত এমন ঝাড়ফুঁক নেই। কুকুরে কামড়েছে, একটুখানি জলপড়ায় সে তা ভালো করে দিত। সাপে ছোবল মেরেছে—পিঠের ওপর পেতলের থালা আটকে দিয়ে তার ওপর মন্ত্রপড়া মাটি ছড়িয়ে সে বিষ নামিয়ে নিত। ভূতে ধরলে তো আর কথাই নেই, নিধিরাম না গেলে কার সাধ্য সে ভূত নামায়। বাণ মারতে পারত, বাটি চালান করতে পারত, জ্বলন্ত একটা প্রদীপ আকাশে উড়িয়ে দিয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারত দূরের কোনো একটা নিশ্চিন্ত নিদ্রিত গ্রামে।

তা ছাড়া বংশানুক্রমিক ভাবে তারা বারোয়ারী শীতলার পূজারী। শুধু পূজারী নয়, দেবীর প্রসাদপুষ্ট। কোনো এক অতীত অনার্য সংস্কৃতির ধারায় অন্তত এখানে ওদের অধিকার অব্যাহত। কোন্ অনাদি কাল থেকে এরা শীতলার পূজো করে আসছে কেউ বলতে পারে না। ব্রাহ্মণের প্রবেশ নিষেধ। শোনা যায় কিছুদিন আগে তন্ত্রসিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন গাঁয়ে। চাঁড়ালে দেবী পূজো করে শুনে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। বললেন, দেবী অশুচি—তাঁকে শোধন করে নিয়ে ব্রাহ্মণকে দিয়ে পূজো করাতে হবে।

গাঁয়ের লোকে নিষেধ করলে, কিন্তু দাম্ভিক তন্ত্রসিদ্ধ সে কথা শুনলেন না। দেবী শোধনের ব্যবস্থা করে পূজোয় বসলেন তিনি। আর পরমুহূর্তেই আশ্চর্যকাণ্ড। কোথা থেকে প্রকাণ্ড একটা চড় বাজের মত শব্দ করে তাঁর গালে এসে পড়ল। অদৃশ্যহাতের সেই চড় খেয়ে ব্রাহ্মণ যে উলটে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না।

সেই থেকে চাঁড়ালেরাই এখানে পূজো করবার কায়েমি অধিকার পেয়েছে। খাতির বেড়েছে তাদের, খ্যাতি বেড়েছে আরো অনেক বেশি। গাঁয়ের উঁচু জাতেরা অসংকোচে অন্ত্যজের দেবীকে পূজো করেন, অন্ত্যজ পূজোরীর ছোঁয়া প্রসাদ পান। আর বসন্ত চিকিৎসার ব্যাপারে অধিকার তো তাদের এক-চেটিয়া।

কোথা থেকে একদিন পেতনী নামিয়ে এসে ভরা দুপুরের সময় নিধিরাম ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেল। আর মারাও গেল তার ঘণ্টাখানিক পরেই। দু'চারজন লোক মুখে বললে, সর্দিগর্মি, কিন্তু সকলেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিলে রোজার ঘাড় ভূতেই মটকেছে শেষ পর্যন্ত।

তার ছেলে অভিরাম। বাপের মতো তারও এমনি হঠাৎ মৃত্যু ঘটে গেল। আশ্চর্য হবার কিছু নেই—এ যেন ইতিহাসের সহজ এবং স্বাভাবিক ধারা। কিন্তু তারও আগে আরো একটু গল্প আছে।

বাঙ্গালা দেশের ওপর দিয়ে মহামন্বন্তর বয়ে গেল।

যারা যাওয়ার তারা তো মরে বাঁচল, কিন্তু যারা রয়ে গেল, তাদের দুর্গতির আর সীমা রইল না। শ্মশান বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে শ্মশানের প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল মানুষ। এক মুঠো কাঁকর মেশানো ভাত সম্বল, এক ফালি ছেঁড়া ন্যাকড়া সম্বল। রাতারাতি যেন সবাই মায়া প্রপঞ্চময় সংসারটাকে চিনে ফেলেছে—দেহে মনে, বেশে বাসে অনাসক্ত বৈরাগ্য। চোখের দৃষ্টি অর্থহীন—যেন বাইরের অবান্তর পৃথিবীটার ফাঁকিটা ধরে ফেলে ব্রহ্মলাভের জন্যে একান্তভাবে অন্তর্মুখী হয়ে গেছে।

শাস্ত্রে বলেছে সবই যখন 'নলিনীদলগতজলমিব'—তখন একটি মাত্র ভরসা আছে। সেটি হচ্ছে সাধুসঙ্গ এবং তার দ্বারাই ভবার্ণব পার হওয়া যায়। এবং ঈশ্বর করুণাময়—সাধুসঙ্গ তিনিপাঠালেন

দুর্ভিক্ষ যখন শেষ হয়ে গেল তখন দেশের লোককে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সরকারী ধানের গোলা বসতে লাগল এখানে ওখানে। এল লাইসেন্সপ্রাপ্ত সরকারী এজেণ্টের দল—মহাজনের করাল গ্রাস থেকে দেশকে বাঁচাবার মহৎ ব্রত নিয়েছে তারা। তার সঙ্গে এল সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টার, এল বোট অফিসার, এল এনফোর্সমেণ্ট—কে এল এবং কে এল না!

এখান থেকে বারো মাইল দূরে ধান-চালের মস্ত বড় একটা

গঞ্জ। তার পাশ দিয়ে যে নদী, বর্ষার সময় ছাড়া তাতে নৌকো চলে না। হাঁটু জলের ওপর যে পরিমাণে কচুরির স্তূপ জমে ওঠে, তাতে বরং মোটর চালিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু নৌকোর প্রশ্ন অবান্তর। অতএব—

অতএব রাস্তা তৈরি করতে হবে।

সে কাজ নিলে কৃষ্ণপ্রসাদ। গৌরী সেনের টাকা—অফুরন্ত এবং অকৃপণ। একবার টেণ্ডার নেওয়াতে পারলে আর ভাবনা নেই। পরবর্তী পথটুকু মসৃণ—তৈলাক্ত।

ধানের আল আর মজা দীঘির পাশ দিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ সাইকেল চালিয়ে এল। বারোয়ারী অশথতলায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো। ভারী ভালো লাগছে ঠাণ্ডা ছায়া আর ঠাণ্ডা বাতাসটা।

—আপনি, হুজুর ?

মস্ত একটা প্রণাম জানিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে অভিরাম।

—আমি ? বাঁ হাতটাকে হাফপ্যাণ্টের পকেটে পুরে কৃষ্ণপ্রসাদ সিগারেটের ধোঁয়া উড়োতে লাগল। বললে, সরকারী লোক। রাস্তা করতে হবে এখানে—আঠারো মাইল দূরের রাস্তা। সরকারী লরী যাবে, গাড়ী যাবে, বুঝেছ ?

—আজ্ঞে রাস্তা ?

নিশ্চয়। মুখস্ত করা লিবুর মতো কৃষ্ণপ্রসাদ বলে গেল,

দেশের ভালোর জন্যেই। চালের ইজি সাপ্লাই হবে—গ্রামের উন্নতি হবে, ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের পথ বন্ধ হবে। একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত।

অভিরাম বিস্মিতমুখে তাকিয়ে রইল। কৃষ্ণপ্রসাদ যেন আকাশ থেকে কথা বলছে। দেশটাকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে নিস্তার দেবার জন্য স্বর্গ থেকে মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে হাফপ্যাণ্টপরা সাইকেলধারী একটি দেবতা। অশথতলায় পাথরের শীতলা নিদ্রিত হয়েই আছেন, কিন্তু ইনি যেমন জাগ্রত, তেমনি মুখর।

ভাবতে পারা যায় রাস্তা তৈরী হবে এই গ্রামের মধ্য দিয়ে? যেখান দিয়ে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে রেল গাড়ী চলে যায়, তার চাকায় চাকায় সর্বদা মুখর সভ্যতার গর্জন, সে এখান থেকে অনেক দূরে! একটা মরা নদীর খেয়া, তিনখানা গ্রাম, ছ'খানা মাঠ, আরো এক ক্রোশ জেলাবোর্ডের পথ। এখানকার মানুষ যেন বাস্তু বেঁধেছে জীবনের তটতীর থেকে বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপের মধ্যে। একটা প্রাইমারী ইস্কুল—সেও তিন মাইল দূরে। রাত্রির অন্ধকারে বহু দূর থেকে যেমন মহানগরীর মাথার ওপরে একটা অস্বচ্ছ জ্যোতির্মণ্ডল দেখা যায়, এখান থেকেও তেমনি নাগরিক জীবনের একটা অলক্ষ্য জ্যোতিঃসংকেত অনুভব করা চলে মাত্র। তবু চৌকিদারী ট্যাক্স আসে, তামাকের ওপরে, দেশলাইয়ের ওপরে নতুন খাজনা আসে, শহরের তৈরী লোভের কারখানা

থেকে মন্বন্তর আসে। এখানে আমদানি নেই—এ শুধু রপ্তানীর দেশ।

এখানে রাস্তা হবে, গ্রামের উন্নতি হবে।

কী রোমাঞ্চকর অনুভূতি! শুধু অভিরাম নয়, অভিরামের মতো দু'চারজন নয়। সমস্ত গ্রামটাই আনন্দিত বিস্ময়ে সজাগ হয়ে উঠল। আর সেই বিস্মিত আনন্দকে তটস্থ করে দিয়ে মাঠের পাশ দিয়ে একরাশ তাঁবু পড়ে গেল। যেন উড়ে এল হাওয়াতে।

পাঁচশো বছর আগে শীতলার থানে মুসলমানদের তলোয়ারের ঘা পড়েছিল—তারপরে আর কোনো জীবনচাঞ্চল্য জাগেনি এখানে। পাঁচশো বছরের মরা গাঙে নতুন করে জোয়ার এল। সেদিন এসেছিল রাষ্ট্রবিপ্লবে, আজ এল মন্বন্তরে।

অশথগাছের ঠাণ্ডা ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে হীরালাল বাগ্দী বললে, কারবারটি একবার দেখছ গুনিন ভাই?

অভিরাম সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল। বললে, হুঁ।

—উঃ কী পেল্লায় কাণ্ড করছে রে বাবা। বনজঙ্গল গাছপালা সব লোপাট করে দিয়ে সড়ক বানাচ্ছে। মানুষের নাকি আর ভাতের দুঃখু থাকবে না। এই যদি মনে ছিল-রে বাপু, তা হলে কটা দিন আগে এলিনে কেন? সব সাবাড় করে দিয়ে—

—তখন তো ওদের সময় হয়নি।

—ওদের সময় হয় একটু দেরীতে, তাই না?—হীরালাল

রসিকতার চেষ্টা করলে, সিঁদেল চোরে সব লোপাট করে নিয়ে তিন মাইল ডাঙা পেরিয়ে গেলে চৌকীদারে এসে হাঁক পাড়ে।

অভিরাম জবাব দিলে না—কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সামনে যা চলছে তা প্রলয় কাণ্ডই বটে। পাথরের মতো শক্ত টিলা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে—সাফ হয়ে যাচ্ছে জঙ্গল, আদ্যিকালের পচা ডোবাগুলো দেখতে দেখতে ভরাট হয়ে গেল, আর নাকি ম্যালেরিয়া থাকবে না দেশে। শাবল, গাঁইতি, কোদাল। একশো কুলি খাটছে—শব্দ উঠছে ঝপ্-ঝপ্ ঝপাস, ঠন-ঠন ঠনাঠ্ঠন। কোদালের মুখে মাটির তলা থেকে বাদামী রঙের মানুষের হাড় উঠে আসছে, পাঁচশো বছর আগেকার হাড় কি-না কে জানে!

চোখ দুটোকে হঠাৎ সঙ্কুচিত করে আনলে অভিরাম। মোটা মোটা ভ্রূদুটো এক সঙ্গে এসে যোগ হয়ে গেল, তার ওপরে রেখা ফুটল একটা অর্ধবৃত্তের আকারে।

—লক্ষণ আমার ভালো লাগছে না হীরু।

—কেন গুনিন ভাই, কেন?

কী জানি কেন। অভিরাম নিজেও জানে না। হয়তো এই আকস্মিকতাকে ভয়—হয়তো এই নতুনকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। গাঁইতি আর কোদালের মুখে পুরানো মাটি যেন যন্ত্রণায় কেঁদে উঠছে, যেন অভিশাপ দিচ্ছে। অথবা এ হয়তো ওর রক্তার্জিত সংস্কার। আকাশে বাতাসে যেসব অশরীরী

শক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই সভ্যতা বর্জিত নগণ্য গ্রামে যাদের ছিল একাধিপত্য'; রাতদুপুরে যারা অকারণে ঝপঝপ সরসর করে প্রকাণ্ড বটগাছের ডালপালাগুলোকে ঝাঁকিয়ে দিত, ভরা অমাবস্যায় মড়ার মাথা নিয়ে যারা শ্মশানে খটাখট করে গেণ্ডুয়া খেলত আর খিলখিল করে হাসত, কিংবা পুরানো দীঘির ধারে যাদের মুখে লকলক করে আগুন জ্বলে উঠত—তারাই কি প্রেত-সিদ্ধ গুনিনের অনুভূতির ওপরে সঞ্চারিত করছে তাদের অলৌকিক প্রতিবাদ ?

রহস্যময় মুখখানাকে আরো রহস্যময় করে গুনিন বললে, সে থাক।

ওদিকে রাস্তা তৈরী হয়ে চলেছে। চমৎকার রাস্তা—উঁচু নীচু অসমতল মাটিকে দীর্ণবিদীর্ণ করে দিয়ে সরকারী লরীর মসৃণ মনোরম চলবার পথ। রাজপথ। কিন্তু কাজ এগোতে পারছে না। কৃষ্ণপ্রসাদ হিসেব করে দেখলে এভাবে চললে বাঁধা সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে না। ওপরওলা আর কর্তাদের কাছ থেকে তাগিদের পর তাগিদ আসছে। অতএব আরো লোক চাই। ঝড়ের গতিতে কাজ শেষ করো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পথ তৈরী করে দাও। যুদ্ধ—খাদ্য-সঙ্কট—এমার্জেন্সি।

কুলির জন্য খবর গেল সদরে। কিন্তু কুলিরও বাজার দর বেড়েছে—বর্মা থেকে আসামফ্রন্ট পর্যন্ত তাদের চাহিদা। আরো

এই অজগর বিজেবনে লোক পাঠানোর বন্দোবস্ত করাও শক্ত। সুতরাং সদর থেকে পালটা খবর এল, লোক্যাল রিক্রুট করো।

কৃষ্ণপ্রসাদের স্বর্গীয় আভিজাত্য আর রইল না। খাকি হাফপ্যান্টের নীচে হাঁটু পর্যন্ত জমে উঠল ধুলো। ঘরে ঘরে তাগিদ পড়ল ঃ এসো তোমরা কাজে লেগে যাও সবাই।

সকলের হয়ে এগিয়ে এল অভিরাম।

—কুলির কাজ আমরা করব না হুজুর।

বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ বললে, কেন ?

—আমাদের বাপ পিতামো কখনো মাটিতে কোদাল মারেনি—ছোট কাজ করেনি। সে পারে ছাতুরা, আমরা পারব না।

ছোট কাজ ! কৃষ্ণপ্রসাদ হেসে উঠল হা হা করে। এক-বেলা খেতে জোটে না—আভিজাত্যের জ্ঞানটা টনটন করছে একেবারে। ঢোঁড়া নয়, হেলে সাপ ; কুলোপনা চক্কর নয়, বারকোশপানা। কিন্তু পরক্ষণেই বেদনায় কৃষ্ণপ্রসাদের গলার স্বর যেন ভারী হয়ে গেল।

—ছিঃ, ছিঃ একী কুবুদ্ধি তোদের ! গায়ে খাটবি, পয়সা পাবি, এতে অপমানের আছে কী ? এই জন্যেই না বাঙালীর এমন দুর্দশা। তাই এই ঘরপোড়া দুর্বুদ্ধির জন্যেই তো এত লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরল। অথচ পশ্চিম থেকে হিন্দুস্থানী কুলি এসে কীভাবে যে বাঙালীর দেশকে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে—

পাঁচ মিনিট একটা দীর্ঘ টানা বক্তৃতা, উদারা মুদারা এবং তারায়। ঘুরে ফিরে অতি কোমল নিখাদে এসে যখন যুক্তিপূর্ণ ভাষণটা সমাপ্ত হল, দেখা গেল আবেগে কৃষ্ণপ্রসাদের চোখের কোণায় কোণায় জলের বিন্দু দেখা দিয়েছে।

—এখনো ভেবে ছ্যাখ সবাই। এক বেলা তো পেট পুরে ভাত জুটছে না তোদের। আর কুলিগিরি করে যা মজুরী পাবি তাতে—

অর্ধভুক্ত ক্ষুধিত চোখগুলো লোভে জ্বলজ্বল করে উঠল। দৃষ্টির সামনে ঝলক দিয়ে গেল সোনালি মরীচিকা। সত্যিই তো অন্যায়টা তাদের কোনখানে। জমিতে যদি লাঙ্গল ঠেলতে পার তাহলে কোদাল মারলে মহাভারত সত্যিই কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

অভিরাম মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললে, কিন্তু বাবু—

কিন্তু লোকচরিত্র বোঝে কৃষ্ণপ্রসাদ। অভিরামের সর্বাঙ্গে বিদ্রোহ ঘনিয়েছে—গাঁয়ের লোকের ওপরে তার অপ্রতিহত প্রতিপত্তি, বিদ্বান নতুন লোক এসে সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে এটা সে কল্পনাই করতে পারছে না। কিন্তু সে আধিপত্যটা আধ্যাত্মিক—আধিভৌতিক প্রয়োজনের দাবীটা ঢের ঢের বেশি এবং বাস্তব—এই সহজ কথাটুকু বোঝবার বুদ্ধি কৃষ্ণপ্রসাদের আছে।

ঠোঁটের কোণা ছুটো একটু বিস্তৃত করে কৃষ্ণপ্রসাদ তীক্ষ্ণ সর্পিল হাসি হাসলে। অভিরাম ছাড়া আর সমস্ত মানুষগুলির

মুখই একাকার হয়ে গেছে। অলৌকিক ভীতি নয়—লৌকিক ক্ষুধা। লোভে এবং দ্বিধায় তারা বিচলিত হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের জন্যে কৃষ্ণপ্রসাদ অনুভব করলে অভিরাম তার প্রতিদ্বন্দ্বী তার ক্ষমতা লাভের পথে প্রতিপক্ষ। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদের হাসিটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে আরো খানিকটা বিস্মৃত হয়ে পড়ল : শেষ পর্যন্ত জয় হবে তারই।

পকেট থেকে কালো চামড়ার নোট বই বেরুল।—বলো, কে কে রাজী আছো।

একবার কৃষ্ণপ্রসাদ আর একবার অভিরামের মুখের দিকে তাকালো সকলে। অভিরামের চোখ ছুটো জ্বলজ্বল করছে, শক্ত হয়ে উঠেছে খাড়া চোয়াল। যেন যে নাম লেখাবে, বাঘের মতো তারই ঘাড়ের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে সে।

কিন্তু জয় হল অপদেবতার নয়—সরকারী কণ্ট্রাক্টারের। কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নিস্কম্প স্তব্ধতায়। তারপর গলাটা সাফ করে নিয়ে হীরালাল বললে, লিখুন—

অভিরাম নড়ে উঠল। ছুটো চোখ থেকে এক ঝলক আগুন বৃষ্টি করলে যেন। তারপর হনহন করে হেঁটে চলে গেল।

এবারে শব্দ করে হেসে উঠল কৃষ্ণপ্রসাদ : লোকটা পাগল নাকি ?

গাঁয়ের লোক সে হাসিতে যোগ দিল না।

গুনিনের চোখের সামনে দিয়েই সরকারী রাস্তা তৈরী হয়ে চলল। সবাই খাটে সেখানে, হীরালাল, মতিলাল, জনক। তিন চার দিনের মধ্যেই হালচাল বদলে গেছে তাদের। রাতারাতি সব বড় মানুষ। গাঁয়ের দুঃখ দূর হল এতদিনে। কৃষ্ণপ্রসাদের বক্তৃতায় ফাঁকি নেই। দেশের দুঃখে ঝরে-পড়া তার চোখের জল যে নিঃসন্দেহে আদি এবং অকৃত্রিম, এ সম্পর্কে মনে আর কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না।

এক পয়সার বিড়ি জুটত না কোনকালে, টুকরো বিড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ধূমপানের তৃষ্ণাটা নিবারণ করত জনক। সেই এসে হাজির হল এক বাক্স সিগারেট নিয়ে। বললে, নাও গুনিন একটা সিগারেট নাও। ভালো জিনিস—ঠিকাদারবাবু দিয়েছে।

অসীম বিরক্তিভরে অভিরাম বললে, নাঃ।

—না? কেন, আপত্তিটা কিসের? সত্যি ভায়া তুমিই ঠকলে। খালি ভুত ঝাড়লেই কি পেটের ব্যবস্থা হয় আজকাল? চলে এসো আমাদের সঙ্গে, দুকোপ মাটি তোল, দিনমজুরী দুটো টাকা তোমার রোখে কে?

—একটা চড় মেরে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

আস্তে আস্তে জনক পিছু হটতে লাগল। ভীরু গলায় বললে, কেন—কেন অন্যায়টা কী বলেছি। সবাই যখন দু-পয়সা করে নিচ্ছে—

—দু পয়সা!—হঠাৎ রাক্ষসের মতো গলায় গুনিন গর্জে

উঠলঃ নিজের মান-সম্মান বিসজ্জোন দিয়ে অমন পয়সার মুখে লাথি মারি আমি। ভাবিসনি, এ সুখ তোদের সইবে। মা শীতলে জেগেই আছেন—জানলি, ধর্মের গাঁয়ে কখনও অধর্মো তিনি সইবেন না।

জনকের বুকের মধ্যটা কেঁপে গেল। শাপ দিচ্ছে নাকি গুনিন! মন্ত্রসিদ্ধ ভূতসিদ্ধ লোক সে, তার অসাধ্য কুকাজ নেই। একি শুধু কথার কথাই—না এমনিভাবে দেশশুদ্ধ লোকের সর্বনাশ করবার মতলব আঁটছে সে! কিন্তু কেন? এমন কি অপরাধ করেছে তারা। ঘরের ভেতর ছটফটিয়ে মরলেও যখন একটিবার কেউ ডেকে জিগেস্ করে না কিংবা এক ফোঁটা জল দেয় না খেতে, তখন গায়ে গতরে খেটে দুটো পয়সা রোজগার করলে কার কী বলবার আছে। অথচ কেন এমন করছে গুনিন, কেন সে এমন ভাবে হিংস্র হয়ে উঠেছে! জনক কিছু বুঝে উঠতে পারল না।

কিন্তু সবের মধ্যেই যে ভূতে ধরেছে সে খবর অভিরামের জানা ছিল না।

সন্ধ্যার সময় গুনিনের বউ পদ্মা এসে সামনে দাঁড়াল। বললে, একটা কথা বলব?

কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে অভিরাম ডালা বুনছিল। বললে, কী বলবি?

—গাঁয়ের মেয়েরা তো সবাই রাস্তায় কাজ করতে যাচ্ছে। দু পয়সা পাচ্ছেও। তাই—

—তাই?—হাতের ডালাটা নামিয়ে রেখে সন্দিগ্ধ উগ্র চোখে তাকালে অভিরাম। চোয়ালের হাড় দুটো কঠিন হয়ে উঠেছে, মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো নেমে এসেছে কপাল ছাড়িয়ে। অগ্নিগর্ভ স্বরে বললে, তাতে কী হয়েছে!

—ডালা-কুলো বেচে আর ভূত ঝেড়ে তো সংসার চলে না। যা আকাল পড়েছে! আমিও যদি ওখানে গিয়ে কাজ করি, তা হলে অন্তত একটা করে টাকা—

অভিরাম তীরের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

—খবরদার, খবরদার পদ্মা। ওকথা আর একবার মুখে আনবি তো সোজা খুন হয়ে যাবি। গুনিনের বংশ আমরা। মা শীতলার দয়া আমাদের ওপরে। ঘরে না খেয়ে মরে থাকবো সে-ও ভালো; কিন্তু ওসবের মধ্যে আমরা নেই। গোলামী করি না আমরা—ছোট কাজ করি না।

চাঁড়ালের ঘরের সুন্দরী বউ পদ্মা ঠোঁট ওলটালো। স্বাস্থ্যপুষ্ট কালো শরীরটা যেন নদীর জলের মতো ছলছলিয়ে উঠল চাঞ্চল্যে এবং অবিশ্বাসে।

—তোমার মান নিয়েই তুমি গেলে। সবাই যখন কাজ গুছিয়ে নিলে, তখন—

পদ্মাকে মারবার জন্যে একটা ব্যাঘ্রমুষ্টি তুললে অভিরাম।

আর সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে ডাক পড়ল, গুনিন—গুনিন ?

—কে ?

অপরাধী গলায় উত্তর এল ঃ আমি হীরালাল।

একটা ঘোমটা টেনে ঘরের মধ্যে সরে গেল পদ্মা, আর কেরোসিনের অনুজ্জ্বল আলোর সামনে হীরালাল এসে দাঁড়াল। চোখে দুটো ভীতিতে বিস্ফারিত এবং বিহ্বল।

—কি হয়েছে ?

—একবার এসো ভাই। আমার বড় মেয়েটার যেন কী হয়েছে। জ্বর নেই, জারি নেই, সন্ধ্যে থেকে কেবল তড়পাচ্ছে আর থেকে থেকে চোখ উলটে আসছে। তুমি একবার চলো।—হীরালালের গলা কান্নায় কাঁপছে।

—হুঁ, এবার গুনিনকে মনে পড়েছে তা হলে।

—রাগ কোরোনা ভাই চলো। তুমি রাগ করলে আমরা কোথায় দাঁড়াই।

একটা বিরাট আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল অভিরামের মন। খালি কৃষ্ণপ্রসাদ নয়, তারও দাম আছে, তারও প্রয়োজন আছে। এ তাদরে বংশগত অধিকার, মা-শীতলার অনুগ্রহে আধিব্যাধি সারাবার দায়িত্ব একমাত্র তাদেরই। পেটের ক্ষিদে মেটাবার লোভ দেখিয়ে কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রামের লোককে বশীভূত করতে পারে, কিন্তু যে শত্রুকে চোখে দেখা যায় না, তার বেলায় ? মা ওলাইচণ্ডী আর মা শীতলার যে সমস্ত অনুচর দৃষ্টির

অলক্ষ্যে মৃত্যুবাণ নিয়ে ঘুরছে, তাদের হাত থেকে বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করতে পারে কে? অন্ধকার শ্যাঁওড়া গাছে যাদের আস্তানা, কিংবা এলোচুলে ভর সন্ধ্যেতে পুকুর ঘাটে গেলে যাদের নজর পড়বেই—কোন সরকারী ঠিকাদারের সাধ্য নেই যে মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে দিয়ে তাদের বশীভূত করতে পারে।

ছোট বেতের ঝাঁপিটা তুলে নিয়ে অভিরাম বললে, চলো।

হীরালালের দাওয়ায় তখন লোকারণ্য। ছোট মেয়েটা পাগলের মতো ছট্‌ফট করছে, গড়াচ্ছে, কষ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফেনা। অমানুষিক দুটো বড় বড় চোখ মেলে তাকাচ্ছে, আর থেকে থেকে উঠছে প্রচণ্ড এক একটা হিক্কার ধমক। হীরালালের বউ মড়া-কান্নার রোল তুলেছে তারস্বরে।

কটমট করে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল অভিরাম। তারপর সংক্ষেপে বললে, হুঁ, পেত্নীতে পেয়েছে।

বাড়ীময় কোলাহল—কান্নার রোল আরো প্রবল হয়ে উঠল। গুনিন প্রকাণ্ড একটা ধমক দিয়ে বললে, চুপ। কিছু শর্ষের জোগাড় করো।

ভূত ঝাড়া সুরু হল। সর্ষের পর সর্ষের প্রহার—সর্বাঙ্গে জলের ছিটে। কিন্তু পেত্নীর নামবার লক্ষণ নেই। মেয়েটা তেমনি করেই দাওয়াময় গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। থেকে থেকে এমন এক একটা হিক্কা উঠছে যে, সন্দেহ হয় কখন তার দম আটকে যাবে।

অভিরামের কপালে ঘাম জমে উঠতে লাগল। সংশয়ে ভরে যাচ্ছে মন। কিছুতেই কিছু হবার লক্ষণ নয়। সমস্ত বাড়ীময় কালো অন্ধকার ঘনিয়েছে—ছোট আলোটা মিট মিট করছে, নিবে যাবে এক্ষুনি। আর সেই অস্পষ্ট আলোয় মেয়েটার দুটো ভয়াবহ চোখ দেখে তারই অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। কামরূপ-কামিখ্যের ডাকিনীর আদেশ কোন কাজ লাগছে না, বাঁচানো গেল না মেয়েটাকে।

টর্চের জোরদার আলো পড়ল প্রায়ান্ধকার প্রাঙ্গনে। জুতোর মচমচ শব্দ করে এসে ঢুকেছে কৃষ্ণপ্রসাদ। সঙ্গে আরো একটি ভদ্রলোক।

কৃষ্ণপ্রসাদ হাসল ঃ তোমার মেয়ের অসুখের খবর শুনে ডাক্তার নিয়ে এলাম হীরালাল। আমারি বন্ধু—এদিকে কাজে এসেছিলেন। সুবিধেই হলো তোমার।

হীরালাল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললে, গুনিন ওকে ঝাড়ছিল কিনা হুজুর তাই—

ডাক্তার তাচ্ছিল্যভরে বললে, হ্যাং ইয়োর গুনিন। ওসব বুজরুকিতে কাজ চলে না, রোগও সারে না। তোমার ওই ঝুলি কাঁথা নিয়ে সরে দাঁড়াও তো বাপু, আমি একবার দেখি।

বিদ্রোহী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে অভিরাম বসে রইল। এক তিল নড়ল না।

কৃষ্ণপ্রসাদ টর্চের আলোটা অভিরামের মুখের ওপর ফেলল ঃ

একটু সরে বসো তুমি। অনেক তো করলে, কিছু পারলে না দেখতেই পাচ্ছি। এবার ডাক্তারবাবুকে দেখতে দাও।

অভিরাম তবুও নড়ে না। বললে, আমাকে ডেকে এনেছে হীরালাল। আমি ঝাড়ব একে—কোনো ডাক্তার-ফাক্তারের পরোয়া রাখি না আমি।

—নন্‌সেন্স—ইডিয়ট !—নতুন ডাক্তারের ধৈর্যচ্যুতি হল ঃ রোগীকে মেরে ফেলবে নাকি লোকটা ? এদের নামে ক্রিমিন্যাল কেস্ করে দেওয়া উচিত।

অভিরামের মাথায় চড়ে গেল রক্ত, আর উদ্বেলিত সেই রক্তের উচ্ছ্বাস যেন ফেটে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করলে ছুটো চোখের মধ্য দিয়ে। একটা অশ্লীল গাল দিয়ে অভিরাম বললে, খবর্দার !

মুহূর্তে কোথা থেকে কী হয়ে গেল ! ডাক্তার সজোরে জুতো শুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড লাথি বসিয়ে দিলে অভিরামের বুকের ওপরে। ভূত ঝাড়বার সরঞ্জামগুলোতে বিপ্লব ঘটিয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল অভিরাম। ব্যাপারটা যেন ভোজবাজী—এমন একটা কিছু যে ঘটতে পারে এ যেন কল্পনার অতীত।

জনতা নিঃশব্দ এবং নির্বাক। কৃষ্ণপ্রসাদ বললে, ছিঃ ছিঃ সেন, করলে কী !

সেন তখন রোগীর ওপরে ঝুঁকে পড়েছে নির্বিকার মুখে। শান্ত গলায় জবাব দিলে, যা করা উচিত, তাই করেছি।শূয়োরের

বাচ্ছাটা পেসেণ্টকে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছিল—তার ওপরে আবার লম্বাই চওড়াই ! চৌধুরী, এক কাজ কোরো—কালই ওই স্কাউণ্ড্রেলটাকে হ্যাণ্ড্-ওভার করবার বন্দোবস্ত করে দিয়ো। রেগুলার মার্ডারার ! কত লোককে এই ভাবে মেরে ফেলেছে কে জানে।

কিন্তু সেন ঠিক সময়মতোই এসে পড়েছিল। একটা ইঞ্জক্শনেই রোগী স্বাভাবিক হয়ে উঠল আস্তে আস্তে, হিক্কার প্রকোপটা কমে গেল ক্রমশ। উঠে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে ডাক্তার বললে, অল্ রাইট, ক্রাইসিস কেটে গেছে। বাই দি বাই, সে জোচ্চোরটা গেল কোথায় ?

ডাক্তারের লাথি খেয়ে অন্ধকার উঠানে ছিটকে পড়েছিল গুনিন। কিন্তু সেখানে সে নেই, কোন ফাঁকে সে উঠে গেছে কেউ টেরও পায়নি।

রাত ঝম ঝম করছে। একফালি অনুজ্জ্বল চাঁদ উঠেছে আকাশে, তার আলোয় দেখা যাচ্ছে মাঠের ওপারে কতগুলো শাদা পাখীর মতো তাঁবুগুলো ঘুমন্ত হয়ে আছে। একটু আগেই জোরালো আলো জ্বলছিল ওখানে, আসছিল কুলিদের দুর্বোধ্য গান, আর ঢোলের কলরব। কিন্তু এখন নীরব হয়ে গেছে

সমস্ত, ঝিমিয়ে পড়েছে যেন গভীর একটা অবসাদের মধ্যে। তার সামনে সাদা একটা সাপের মতো পড়ে রয়েছে নতুন পথ —রাজপথ। ওই পথ—ওই সাপটার বিষনিশ্বাস অনুভব করছে অভিরাম—তার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে, যেন জ্বলে যাচ্ছে সমস্ত।

বুকের ভেতরে তখনো টনটন করে একটা ব্যথা চমক দিয়ে যাচ্ছে—জোর লাথি মেরেছে ডাক্তার। গুনিন বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। পাশে মড়ার মতো অঘোরে ঘুমুচ্ছে পদ্মা।

অভিরাম উঠে আলো জ্বালালো। ঘরের এক কোনা থেকে বার করলে লাল কাপড়ের একটা পুটুলি। অসহ্য উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে—তার চোখে তীক্ষ্ণ আর শাণিত হয়ে উঠেছে হত্যাকারীর দৃষ্টি। শুধু একজন মানুষকে সে খুন করবে না —শুধু ওই ডাক্তারকেই নয়। এই পাপকে—এই লাঞ্ছনা আর অপমানের হেতুকে ঝাড়ে মূলে উচ্ছন্ন করবে সে।

একটা কালো বোতলের মধ্যে কতগুলো শাদা গুঁড়ো সে চোখের সামনে তুলে ধরল। কৃষ্ণপ্রসাদ কল্পনা করতে পারে না, ডাক্তারের ভাববারও ক্ষমতা নেই—ওই বোতলটার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে দেশব্যাপী মহামারী। ওই বোতলের শাদা গুঁড়োগুলো আর কিছু নয়—বসন্তের বীজ—শুকনো গুটির মামড়ী। এগুলো ওরা সংগ্রহ করে ওষুধে লাগাবার জন্যে —আর সময় বিশেষে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে। অবিশ্বাসীকে কঠিন শাস্তি দেবার জন্য গুনিনেরা বহুবার ওই

মৃত্যুবিষ বর্ষণ করেছে তার বাড়ীতে, উড়িয়ে দিয়েছে হাওয়ায়, মিশিয়ে দিয়েছে কুয়োর জলে। কদিনের মধ্যে পাওয়া গেছে, হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ ফল। বহুদিন পরে ওই মারণাস্ত্র প্রয়োগ করবার প্রয়োজন এল আবার। বোতলের কারাগারে যে মৃত্যু-রাক্ষস বন্দী হয়ে আছে, একবার ছাড়া পেলে সে আর ক্ষমা করবে না—নিঃশেষে গ্রাস করে নেবে সমস্ত। ওই ডাক্তার—ওই কৃষ্ণপ্রসাদ—ওই কুলিদের উপনিবেশ, দুদিনের মধ্যেই মৃত্যুর কলরবের মধ্যে তলিয়ে যাবে সমস্ত।

নিঃশব্দে ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে অভিরাম বাইরে বেরিয়ে এল। ম্লান জ্যোৎস্নায় পাড়ার কুকুরগুলো গুনিনের একটা ছায়া-মূর্তি দেখে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল—পর মুহূর্তেই থেমে গেল আবার। সন্ধ্যাবেলা কারা যেন শূয়োর পুড়িয়েছিল—এখনো পোড়া মাংস আর পোড়া কাঠের গন্ধ বাতাসে সমাকুল হয়ে আছে। বড় একটা যজ্ঞ ডুমুরের ঝুপসী গাছ থেকে একটা কাক বোধ হয় স্বপ্ন দেখেই জড়িত কণ্ঠে ডেকে উঠল—রাত্রে কাকের ডাক অত্যন্ত দুর্লক্ষণ। কা—কা—কা—। গুনিনের মনে হল, যেন বলছেঃ খা—খা—খা—

অন্ধকার শীতলার থানের দিকে এগিয়ে চলল অভিরাম। ঝুরি-নামা অশ্বত্থ গাছের পাতায় প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাস। বাইরের জ্যোৎস্নার আক্রমণে পলাতক তমিস্রা যেন এখানে এসে ঘনীভূত আশ্রয় নিয়েছে। শীতলার থানের ওপর গুচ্ছে গুচ্ছে জোনাকি

জ্বলছে—যেন রাক্ষুসে-দেবতা সহস্র সহস্র চোখের আগুন শাণিত করছে সমস্ত পৃথিবীর ওপরে ছড়িয়ে দেবার জন্যে।

মাঠের ওপরে দেখা যাচ্ছে নতুন রাস্তা—জ্যোৎস্নায় রহস্যাতুর রাজপথ। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশকে বাঁচাবার জন্যে রাজকীয় প্রতিশ্রুতি। সিভিল সাপ্লাইয়ের শুভ-বুদ্ধিতে গৌরী সেনের টাকার সদাব্রত। তার ওপরে তাঁবুর সমারোহ—কৃষ্ণ-প্রসাদের উপনিবেশ।

শীতলার থানে একটা প্রণাম করলে গুনিন। কল্পনা করে নিলে বিস্ফোটক-ভূষিতা দেবীর করালীমূর্তি। সারা গায়ের ক্ষত চিহ্ন থেকে রক্ত আর পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে। এক হাতে মারণ-শূর্প—তার বাতাসে মহামারীর বিষ উড়ে যাচ্ছে দেশে দেশে। গর্দভাসীনা দেবীর প্রসারিত জিহ্বা থেকে রক্ত পড়ছে গড়িয়ে।

গায়ের লোমগুলো রুদ্ধ উত্তেজনায় কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় দীর্ঘ ছায়া ফেলে ফেলে অভিরাম অদৃশ্য হয়ে গেল।—

—তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

শহরের থেকে বন্দোবস্ত বা ডাক্তার আসবার আগেই কৃষ্ণপ্রসাদের কলোনীতে বসন্ত স্থরু হল। কাকতালীয়েই হয়তো। অতএব—

ভীত কৃষ্ণপ্রসাদ বললে, ষ্ট্রাইক দি টেণ্ট্।

নতুন পথ অসমাপ্ত রেখেই কৃষ্ণপ্রসাদের দলবল পিছিয়ে

গেল দশ মাইল দূরে। বিলীয়মান গোরুর গাড়ীর সারির দিকে তাকিয়ে পিশাচের মতো হাসল অভিরাম। তার জয় হয়েছে। দেবী তার সহায়—জয় তার নিশ্চিত।

কিন্তু মহামারীর রাক্ষসটা কৃষ্ণপ্রসাদের তাঁবুতেও আর সীমাবদ্ধ রইল না। নির্বিচারে তার ক্ষুধা বিস্তীর্ণ হয়ে এল গ্রামের দিকে। যারা বাইরে থেকে এসেছিল তারা পালিয়ে বাঁচল, কিন্তু যাদের বাইরে যাবার জায়গা নেই—বসন্তের আক্রমণ তাদের ওপরেই ভেঙে পড়ল অনিবার্যভাবে।

এবার কোথায় গেল কৃষ্ণপ্রসাদ, কোথায় গেল কে। অভিরাম ছাড়া আর উপায় নেই কারো। একটি ব্রহ্মাস্ত্রেই সম্রাট নিজের রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

—বাঁচাও গুনিন, বাঁচাও।

অভিরামের ঠোঁটে ধারালো হাসি: কেন, সরকারীবাবু কোথায় গেল? তাকে ডেকে পাঠাও না।

—রাগ কোরো না ভাই, দয়া করো। তুমি ছাড়া আর কে আছে! এ সময়ে তুমি না এলে—

তারপর একদিন অভিরামের হাসিও বন্ধ হয়ে গেল। বসন্ত হল পদ্মার। লক্ষ্য ভেদ করে ব্রহ্মাস্ত্র যে আবার তার বুকের দিকেই ফিরে আসবে এ কথা তো গুনিনও জানত না।

অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে গেল পদ্মা। চাঁড়ালের সুন্দরী বউ পদ্মা। অমন অপূর্ব দেহটা তার পচে গেছে, এমন

বীভৎস হয়ে গেছে যে সেদিকে তাকালো চলে না। সৌন্দর্যের আবরণের তলা থেকে বীভৎস নরককুণ্ড।

এইবার মাটীতে আছড়ে আছড়ে কাঁদলে অভিরাম। —কী করলাম, কী করলাম আমি!

কিন্তু সব চাইতে বড় আঘাত তখনো তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। পদ্মার মৃতদেহ সরাতে গিয়ে বিছনার তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা চমৎকার সোণার আংটি—ঠিক এই আংটিটাই কার হাতে দেখছিল সে? ডাক্তারের, না কৃষ্ণ-প্রসাদের! তা হলে? তা হলে পদ্মা?—

শোক মিলিয়ে গেল—মাথার মধ্যে জ্বলে যেতে লাগল দুঃসহ একটা অগ্নিকুণ্ড। তা হলে শেষ পর্যন্ত জয় হল কার? চরম অপমান আর চরম পরাজয়ের মধ্যে তাকে ফেলে গেল কে? গ্রামের ঘরে ঘরে মড়া-কান্না উঠেছে—অভিরাম কি এই চেয়েছিল? আর পদ্মা? পদ্মা? এই সোণার আংটি?

পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল গুনিন। লাল পুঁটলিটার মধ্যে নানা জাতের তীব্র প্রাণঘাতী বিষ সঞ্চিত আছে—অভিরাম হার মানবে না। না—কিছুতেই না।

* * *

কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদ ভালো লোক

সরকারী ডাক্তার, স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার আর ভ্যাকসিনেটারের একটা ছোট দল নিয়ে সে গ্রামের দিকে আসছিল। বারোয়ারীতলার কাছাকাছি আসতেই দলটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল একবার। দিনে-দুপুরেই গুনিনের বিষ-জর্জরিত মৃতদেহটা শেয়ালে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল সেখানে।

—অ্যানাদার ভিকটিম—ডাক্তার বললেন।

চক্রব্যূহ

সরকার সেলাম—

বন্দীরা উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। এটা নিয়ম—শান্তি আর শৃঙ্খলার অপরিহার্য অনুশাসন। অবহেলা করলেই ওজন মাফিক পদাঘাত। উঠে দাঁড়াতে এতটুকু দেরী হলে মুখ থুবড়ানো একটা আছাড় খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তার।

সরকার সেলাম—

হাতের পর হাত উঠে যাচ্ছে কপালে। যত বিদ্রোহীই হও, যত বাঁকাই হোক ঘাড়—এখানে এলে সব সিধে হয়ে যাবে। নৈতিক আরোগ্যশালায় মানুষের যাবতীয় ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। কেউ বাদ নেই রোগীর দলে। চোর, পকেটমার, লম্পট, আত্মহত্যা-কামী, হত্যাকারী, বিনা টিকিটের যাত্রী, ভারত রক্ষা বিধান অমান্যে অপরাধী এবং দেশপ্রেমিক। ব্যাধিগুলি মানসিক হলেও শলাকা প্রয়োগটাই একটু বেশী। পুন্নাম, রৌরব এবং কুম্ভীপাকের ইহলৌকিক সংস্করণ। ইংরেজের জেলখানা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীটা কেন যে স্বর্গপুরী হয়ে যায় না এইটেই আশ্চর্য!

এক—দুই—তিন—চার—

গুণতি করে চলেছে ওয়ার্ডার। পাঁচ—ছয়—সাত—

কিন্তু আঠারো নম্বর? আঠারো নম্বর?

আঠারো নম্বর নেই—কোথাও নেই। চক্ষে বিশ্বাস করা যায় না—ব্যাপারটা স্বপ্ন হলেই ভালো হত। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই এবং এমন একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন স্বপ্নই হতে পারে না কখনো। ওয়ার্ডারের মাথায় নীল আকাশ ফুঁড়ে বাজ নেমে এল কড়াক্কড় শব্দে।

ঢন্—ঢন্—ঢন্—

আর্ত চীৎকার করে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল—সমস্ত জেলখানা সমুদ্রের মতো মথিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। সসাগরা পৃথিবী—অর্থাৎ এস্-ডি-ও থেকে টাউন দারোগা পর্যন্ত—এক সুরে আর্তনাদ করে উঠল: আঠারো নম্বর?

কিন্তু কোথায় কে!

আঠারো নম্বর তখন একটা মরা-নদীর পাশে পাশে গা-ঢাকা দিয়ে হেঁটে চলেছে। দু'পাশে ঘন বাঁশ আর আমের ছায়া—আসন্ন সন্ধ্যায় অমাবস্যা রাত্রির মতো সে ছায়া কালো হয়ে গেছে। অন্ধকারে অন্য মানুষ তো দূরের কথা, নিজেকেই সে দেখতে পাচ্ছে না। তবু থেকে থেকে শঙ্কিত সংশয়ে সর্বাঙ্গ-কেঁপে উঠছে তার, থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

কেউ কি আসছে? কেউ কি দেখতে পাচ্ছে?

চম্‌কে থেমে দাঁড়ায় আঠারো নম্বর। হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত যেন উছলে ওঠে—মনে হয় বুকের স্পন্দনটা এত জোরে বাজছে যে দু' মাইল দূর থেকেও লোকে তা শুনতে পাবে! পায়ের তলায় শুক্‌নো পাতাগুলো এমন ভাবে মচ্‌ মচ্‌ শব্দ করে কেন? নিজেই কি সে নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়াল?

দপ—দপ—দপ—

নদীর ওপারে অত বড় কিসের আলো ওটা? জলটা মুহূর্তে ঝলসে উঠল খানিকটা তীব্র আগুনের আকস্মিক দীপ্তি সম্পাতে! নাঃ, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নিতান্তই আলেয়া।

একটা আম গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে পলাতক বসে পড়ল। আর চলতে পারছেনা সে। সমস্ত দিন পেটে কিছুই পড়েনি— নাড়ি ভুঁড়িগুলো খিদেয় একসঙ্গে জড়াজড়ি করছে—জ্বলে যাচ্ছে। তা ছাড়া একেবারে অক্ষত দেহও সে নয়। অতবড় পাঁচিলের উপর থেকে লাফ দিয়ে নীচের মোটা ডালটা ধরবার সময় পাঁজরে একটা চোট লেগেছিল—তীব্র যন্ত্রণা সেখানে টনটন করে উঠছে। জঙ্গলের পথ দিয়ে ছুটে আসবার সময় লাটা গাছের আঁচড়ে দু'পায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে একেবারে—এখান ওখান থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে ধূলোভরা পায়ের পাতার ওপর। পায়ের তলায় অনবরত খচ খচ করে বিঁধছে—অন্ততঃ ডজন খানেক কাঁটা যে মাংসের ভেতরে ঢুকে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

অসহ্য ক্লান্তিতে পা ভেঙে সে বসে পড়ল মাটিতে। পিপাসায় বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে আর সামনে তারার আলোয় দীপ্তি পাচ্ছে রুদ্ধস্রোতা নদীর কালো জল। সে জল থেকে দুর্গন্ধ আসছে—পচা পাতার, জমাট শ্যাওলার—রাশীকৃত পাঁকের। তবু ওই জলটা তাকে হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করতে লাগল। সমস্ত তৃষ্ণার্ত শিরাস্নায়ুগুলো যেন একসঙ্গে কোলাহল করে বলতে লাগল: চলো, চলো জুড়িয়ে দাও আমাদের। জ্বলে যাচ্ছি—পুড়ে যাচ্ছি আমরা। চলো, চলো—

কিন্তু উঠতে গিয়েও আঠারো নম্বর উঠতে পারল না। অত্যন্ত গভীর অবসাদ। জল সে খাবে, তার আগে একবার বুক ভরে অনুভব করে নেবে তার মুক্তিকে। দীর্ঘ দেড় বছর পরে ফিরে পাওয়া তার স্বাধীন জীবনানন্দকে।

তারায় ভরা আকাশটার দিকে সে একবার তাকালো। অপরিসীম—অপর্যাপ্ত। কোনোখানে এতটুকু ছেদ পড়েনি, কোনোখানে নিষেধের প্রাকার তুলে সেই নীলিমাকে কেউ খণ্ডিত করে দেয়নি। জেলখানার প্রাচীরের ভেতর দিয়ে যে আকাশ সে দেখত—তা যেন তারই মতো বন্দী। সেখানে এক টুকরো মেঘ দেখা দিয়েই পালিয়ে যেত—'ফটিক জল' পাখী নতুন বর্ষার আনন্দে নেচে যেত শুধু একটি মাত্র মুহূর্তের জন্য। ষাঁড়ের কুঁজের মতো ঢেউ খেলানো পাঁচীলের ওপারে মর্মরিত

ছোট একটি নারিকেল কুঞ্জের এক ছোপ সবুজ ছাড়া বিশাল পৃথিবীর মহারণ্যের কোনো সংবাদই পাওয়া যেত না।

আর এই তো দিগন্ত। বন্দী চোখকে মুক্তি দাও—পাঠিয়ে দাও দূরে দূরান্তে। বৃত্তাকার চক্রবালে, মাঠের শেষে—বহু দূরের নাম না জানা গ্রামের সীমানায়। উড়ে চলে যাও শরতের আকাশের সোনা ঝরানো আলো পাখায় মেখে নেওয়া নীলকণ্ঠ পাখীর সঙ্গে সঙ্গে। নদীর চর পেরিয়ে কাশের বনে, কাশের বনের ওপারে তাল আর খেজুরের বীথিতে,—তার পরে আরো দূরে। আকাশের শেষ নেই—অরণ্যের শেষ নেই—দিক প্রান্তরের শেষ নেই—জনপদের ইয়ত্তা নেই এবং মহা পৃথিবীর সীমানা নেই।

আর মানুষ। শাসন আর ভয়। প্রতি মুহূর্তে শৃঙ্খলের পেষণ। দুর্বাক্য। পায়ের বেড়ীতে ঝনাঝন শব্দ তুলে সরকার সেলাম।

কিন্তু এখানে বহুধা আর বহুব্যাপ্ত জীবন। হাটে বাজারে খেয়া নৌকোয়, যাত্রা আর জারি গানের আসরে। এখানে বিয়েতে শানাইয়ের সুর লাগে; এখানের বোধনের ঢাক বাজে—বাঁশি বাজে। এখানে মানুষ হাসে মানুষ কাঁদে। মানুষ ভালোবাসে, মানুষ অপমান করে। কত বিরাট—কত বন্ধনহীন। ঘর এখানে ডাকে, আবার দিগন্ত এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

বুক ভরে প্রকাণ্ড একটা নিঃশ্বাস নিলে সে। ফাল্গুন

এসেছে, আমের বনে ধরেছে মুকুল। বাতাসে ভাসছে মধুর আর মদির গন্ধ। শুকনো পাতার ওপর ঝির ঝির করে চুঁইয়ে পড়ছে মধু—শব্দ হচ্ছে টুপ-টুপ-টুপ। আঠায় পায়ের তলাটা চট চট করছে।

মরা-নদীর ওপর থেকে বাতাস আসছে। হোক দুর্গন্ধ—তবু মুক্ত বাতাস, তবুও মুক্তির বার্তা। মনে হল যেন এতদিন পরে ওর ফাঁকা আর ফাঁপা ফুসফুসটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। যেন শিরার মধ্যে অচল হয়ে থেমে যাওয়া রক্ত আবার পূর্ণ তেজে বইতে সুরু করেছে।

আঠারো নম্বর উঠে দাঁড়ালো। নিঝুম নিঃশব্দ পৃথিবী—শুধু টুপ-টুপ করে মৌঝরাণির শব্দ। এখানে কেউ আর তাকে খুঁজে পাবে না—তার পেছনে পেছনে এতদূরে অন্তত ছুটে আসেনি কেউ। কিন্তু সরকারের শাসন লোহার বেড়ী তখনও পায়ের গিঁটে খট খট করে বাজছে। সরকারী ডোরা কাটা ফতুয়া আর জাঙ্গিয়া এখনো লজ্জা নিবারণ করছে তার। এই রাজকীয় দাক্ষিণ্য থেমে আগে তাকে মুক্তি পেতে হবে।

কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই পায়ে ঠক করে কী একটা ঠেকল তার। শুধু ঠেকলনা—খানিকটা গড়িয়েও গেল যেন। কৌতূহল ভরে সেটাকে তুলে নিতে গিয়েই সে আর্তনাদ করে সভয়ে পিছিয়ে গেল। একটা নরমুণ্ড। বেশিদিনের পুরানো নয়—এখনো তার সঙ্গে শুকনো ক্লেদ আর কয়েকগুচ্ছ চুল জড়িয়ে রয়েছে!

একী ব্যাপার ! অন্ধকারের মধ্যে ঝাপসা দৃষ্টিতেও যেন সে স্পষ্ট দেখতে পেল শুধু একটা নয়—পাঁচটা—ছয়টা—সাতটা —আটটা অগুণতি মানুষের মাথা তার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। দেড় বছরের মধ্যে এই বহু পরিচিত আমবাগানটা এমনভাবে শ্মশান হয়ে গেল কী করে ?

মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেল সব। আমের মুকুলের গন্ধ—তারায় ভরা আকাশ, মরা নদীর ঠাণ্ডা জল। মনে হল এখানে যেন থম থম করছে মৃত্যুর বিভীষিকা। ঊর্ধশ্বাসে আমবাগান থেকে ছুটে পালালো আঠার নম্বর—জীবিতেরা নয়, এখানে মৃতের দল তার পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছে।

নিস্তারণ লোহারের কামারশালা গ্রামের একান্তে।

ছোট চালাঘর। সামনের দরজাটা এত ছোট যে, প্রায় হাঁটু ভেঙ্গে ঢুকতে হয় তার ভেতরে। পয়সার অভাবেও বটে, আর খানিকটা ইচ্ছে করেও বটে—ঘরের দরজাটা নিস্তারণ ছোটোই রেখেছে— ঢোকবার সময় শত্রু, অর্থাৎ পুলিশকে যাতে অনেকক্ষণ দ্বিধা করতে হয় এবং সেই ফাঁকে দরকারী দু'চারটে জিনিষ সে নিরাপদে হাত সাফাই করে ফেলতে পারে। পুলিশের গভীর সন্দেহ তার ওপরে—সে নাকি লোহার ছাঁচ তৈরী করে দিয়ে স্বদেশী টাকা প্রসারের ব্যাপারের সহায়তা করে থাকে।

নিস্তারণ অবশ্য সেজন্যে গর্বিত। এদিক থেকে স্বদেশী বাবুদের সঙ্গে এক জাতীয় একাত্মতা অনুভব করে সে। তোমরা দিশি খদ্দর পরো, তোমরা বিলিতীকে বাদ দিতে চাও—তোমরা বোমা তৈরী করে রাতারাতি স্বাধীনতা আনতে চাও। সেদিক থেকে আমিই বা কম কী। আমিও স্বদেশী জিনিষ তৈরি করছি ; বিদেশীকে প্রাণে না মেরে তার পকেট মারছি—হরে দরে তুটোই এককথা। তা ছাড়া রোমাঞ্চ এবং উত্তেজনা আমার ক্ষেত্রেও একেবারেই কম নয়।

আর নিস্তারণ নিজেও ছোটখাটো মানুষ। ভেতরে ঢুকতে এর চাইতে বড় দরজা তার দরকার হয়না। কৈফিয়ৎ হিসেবে এইটুকু বললেই তার যথেষ্ট।

সেই ছোট দরজাটার ঝাঁপ খোলা। তার ভাই থেকে এক টুকরো লাল আলো বাইরে দপ করে ঝলকে পড়ছে আবার নিবে যাচ্ছে। দশ বারোটা মহিষের নিঃশ্বাস টানবার মতো শব্দ উঠছে একসঙ্গে—হাপর। ঝন ঝন করে ভেতরে হাতুড়ীর ঘা পড়ছে আর খোলা দরজার পাশে আগুনের ফুল্‌কি উড়ে উড়ে এসে বাইরের জোনাকির ঝাঁকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

—নিস্তার দা, নিস্তার দা !

হাপরের দীর্ঘশ্বাসে নিস্তারণ শুনতে পেলনা। আবার দরজায় টোকা দিয়ে তীব্র চাপা স্বরে সে ডাক দিলে, নিস্তারণ দা আছো ?

বাইরে লাল আগুনের যে আভা পড়ছিল, একবার দপ করে উঠেই নিবে গেল সেটা। ঝনাৎ করে করে একটা প্রচণ্ড শব্দ করেই বন্ধ হল হাতুড়ী। শেষ ঝাঁক জ্বলন্ত লৌহকণার জোনাকি এসে অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সদাসন্দিগ্ধ নিস্তারণের ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল একটা রহস্যময় নীরবতায়।

—নিস্তার দা—ঘরে আছো কি ?

—কে ?—লোহার হাতুড়ীটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে মিশ কালো রঙের প্রৌঢ় বেঁটে জোয়ানটা তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করলে : এত রাত্রে কে ডাকছে ?

—আমি বাঙ্গা !

—বা-ঙ্গা !

যেন ঘরের মধ্যে বোমা ফেটেছে একটা, নিস্তারণ থ' মেরে রইল এক মুহূর্ত। গলার স্বরটা চিনেছে, তবু শেষ পর্যন্ত না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

—বাঙ্গা ! কোন্ বাঙ্গা ?

আমাকে চিনতে পারছ না গো ? সোনাডাঙার বাঙ্গা হাড়ী ?

দরজার পথে নিস্তারণ লোহার এসে দাঁড়ালো। সাড়ে তিন হাত মিশ কালো মানুষ—হাত দুটো প্রায় হাঁটুতে গিয়ে ঠেকে। গায়ে জামা নেই—হাপরের আবছা আলোয় দেখা যায় সাপের পাকের মতো যেন তার সারা গায়ে মাংশপেশী আবর্তিত হয়ে

খাচ্ছে। মুখের ওপর ধবধবে সাদা একজোড়া গোঁফ গায়ের ঘোর কালো রঙের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে ছন্দ মিলিয়েছে।

—তুই কোত্থেকে এলি এ সময়ে ?

—আস্তে, চেঁচিয়োনা। আমার দিকে তাকিয়ে দেখনা একবার।

তাই তো। পায়ে বেড়ী, গায়ে সরকারী জাঙ্গিয়া। পলাতকের ক্লান্ত দুর্গম পথ তার শরীরের সর্বত্র প্রত্যক্ষ প্রকট চিহ্ন একে দিয়েছে।

—কী সর্বনাশ, তুই ফাটক থেকে পালিয়েছিস নাকি ?

—পালালাম তো। কদ্দিন আর ভালো লাগে বলো। তিন বছর মেয়াদ হয়েছিল—দেড় বছর খেটেছি আর থাকতে ইচ্ছে করলনা।

—পালিয়ে এলি কী করে ?

বাঞ্ছা দু'তিনটে পোকা-ধরা দাঁত বের করে আপ্যায়নের হাসি হাসল এইবারে। বললে, যেমন করে পালাতে হয় তেমনি করেই। পাঁচীল টপকে, মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গল দিয়ে।

—আয় আয়, ভেতরে আয়। কেউ আবার টপ করে দেখে ফেলবে—নিস্তারণ হাত ধরে তাকে কামারশালার ভেতরে টেনে নিয়ে এল। পেছনে ছোট ঝাপটা ধড়াস করে দিলে আটকে।

ঘরের মধ্যে পোড়া কাঠ কয়লার গন্ধ—পোড়া লোহার গন্ধ—হাপরের পুরোনো চামড়ার গন্ধ। এক পাশে একটা লণ্ঠন মিট

মিট করছে। আগুনের মধ্যে পুড়ে গন্ গন্ করছে লোহা। ছোট ঘর—কোনখানে একটি জানালা নেই—কোথার এতটুকু আলো আসবার অনাবশ্যক পথ রাখেনি নিস্তারণ। একটা গুমোট গরমে হঠাৎ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো বাঙ্গার।

—নাও আগে বেড়ীটার একটা ব্যবস্থা করো দেখি নিস্তার দা। ভদ্দর লোক না হতে পারলে আর ভালো লাগছে না।

ছেনী দিয়ে বেড়ী কাটতে কাটতে নিস্তারণ বললে, পালিয়ে তো এলি, এখন থাকবি কী করে।

—সে ভাবতে হবে না, একটা ব্যবস্থা করে নেবই।

কট্। বেড়ীটা তুখানা হয়ে নীচে পড়ে গেল। শৃঙ্খলের অবসান। বাঙ্গা নিজের পায়ই একবার হাত বুলিয়ে নিলে।

নাঃ, কোনোখানে কিছ বাজছে না। তু'পা হেঁটে দেখলো সারাক্ষণের সে গুরুভারটা দূর হয়ে গেছে। আঃ—কী আশ্চর্য একটা মুক্তির অনুভূতি!

নিস্তারণের ঘরে বসে যে ছোট ছেলেটা হাপর টানছিল, সেই একটা গাঁজার কল্কে এগিয়ে দিলে। হল্‌দে রঙের ন্যাকড়াটা জড়াতে জড়াতে নিস্তারণ বললে, দিবি নাকি একটান।

—নাঃ।—বাঙ্গা হাসল : এবার ওসব ছেড়েই দেব ভাবছি।

—উঁঃ? নিস্তারণ সাদা কালো ভ্রূর নীচে চোখ তুটোকে বার কয়েক নাচিয়ে নিলে। —দেখছি এবারে জেল খেটে তুই সত্যিই মানুষ হয়ে এলি।

বাঞ্ছা এবারেও নিরুত্তরে হাসল।

—তা হলে সিঁদকাঠির আর দরকার হবে না?

—বোধ হয় না।

—যাক বাঁচলি তা হলে—একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে নিস্তারণ বলল: কিন্তু এখন কী করবি? পুলিশ তো ফেউয়ের মতো পিছনে লেগেছে, ধরলে পাক্কা পাঁচটি বছর ঠুকে দেবে।

বাঞ্ছা বললে, তাই ভাবছি। এখন যাচ্ছি বৌয়ের কাছে—শ্বশুর বাড়ীতে। রাতারাতি ওকে তুলে নিয়ে আসামের দিকে চলে যাব। ওদিকে তো শুনেছি যুদ্ধ হচ্ছে, ঢের কুলি খাটছে, তাদের সঙ্গেই—

কুঞ্চিত মুখে নিস্তারণ চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। থেকে থেকে হাপরের আগুনের এক একটা লাল আভা তার মুখের ওপর এসে পড়তে লাগল।

—জেলেই বোধ হয় ভালো ছিলি বাঞ্ছা!

—কেন? বাঞ্ছা বিস্মিত দৃষ্টিতে নিস্তারণের রহস্যমণ্ডিত মুখের দিকে তাকালো।

—না, সে থাক।

বাঞ্ছা উদ্বেগ বোধ করতে লাগল। নিস্তারণের কথার মধ্যে কেমন একটা সুর আছে—নিহিত আছে এমন একটা ইঙ্গিত যাতে সমস্ত মন সংশয়ে আচ্ছন্ন করে তোলে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে

নিস্তারণের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললে, নিস্তার দা।

—কী বলছিলি ?

—সেখ বাড়ীর আমবাগানে অত মড়ার হাড় কেন ?

নিস্তারণ মুখের পাশে গাঁজার ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনা করতে লাগল : মানুষ মরেছে।

—অত মানুষ ! কী হয়ে মরল ?

—কী হবে আবার, মরতে হয় তাই মরেছে। সে যাক। তুই রাত্তিরটা এখানেই থাকবি, না চলে যাবি বৌয়ের কাছে ?

—চলেই যাই।—বাঙ্কার মুখে এক সঙ্গে উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছে : আমার যেন কি রকম লাগছে নিস্তার দা। এই দেড় বছরে দেশটা এত বেশী বদলে গেল নাকি ?

—সবই তো বদলায়। পৃথিবী যে বদলাল তাতে আর আশ্চর্য কী।

আবার খানিকটা নীরবতা। হাপরের হাওয়ায় আগুন চমকে উঠছে। নিস্তারণের মুখের ওপর খেলা করে যাচ্ছে হিংস্র একটা আরক্ত আভা।

নিস্তারণ বললে : থাক, ওসব কথা থাক। যাবি তো সরকারী কাপড় চোপড় বদলে যা। একটা ছেঁড়া ধুতি দিয়ে দিই বরং। ও বেশে রাস্তায় বেরুলে তো রক্ষা থাকবেনা।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার মেঠো পথ দিয়ে এগিয়ে চলল

বাঞ্ছা। তারায় ভরা মুক্ত আকাশের আশীর্বাদ, তমসা-বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ পৃথিবীর আহ্বান। রাত্রির পাখী ডাকছে—শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে হাওয়া। কারণে অকারণে কুকুর ডেকে উঠছে—দূরদূরান্ত থেকে তার উত্তর আসছে।

মুক্তি। পায়ে বেড়ী নেই—আঁটোসাঁটো জাঙ্গিয়া নেই। ষাঁড়ের কুঁজের মতো ঢেউ খেলানো প্রাচীরের আড়ালে অবরুদ্ধ জগৎ। সেলের ভিতর থেকে খুনী আসামীটা থেকে থেকে পাগলের মতো চীৎকার করে ওঠে। পাথর ভাঙতে ভাঙতে শিস্ দিয়ে একটা অশ্লীল গান গেয়ে ওঠে একজন। হঠাৎ আসে ভোজপুরী ওয়ার্ডারটা। যমদূতের মতো চেহারা—সিদ্ধির নেশায় দুটো টকটকে রাঙা চোখ। বাপ-বাপান্ত ছাড়া আর কোনো সম্ভাষণই জানে না সে।

—অ্যাও শালা—ক্যা হোতা হ্যায়?

—ক্যা হোতা হ্যায় জমাদারজী?

আর জমাদারজী। লাথিটা ঠিক যুৎমাফিক এসে পড়েছে। পাথরের ওপর পড়েছে মুখটা—ঠোঁটটা ছেঁচে গেছে খানিক। দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে।

তবু সে অবস্থায়ও হাসতে হয়।

সমস্ত মুখটা রক্তে রাঙা হয়ে গেছে। দুই কষে রক্ত—তবু একটা বিগলিত চরিতার্থ হাসি। যেন জমাদার লাথি মারেনি, পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়েছে মাত্র।

—কসুর মাপ করো জমাদারজী—

—সরকার সেলাম—

নকীবের হুঙ্কার। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত—আর্যাবর্ত-দাক্ষিণাত্য নিনাদিত রাজকীয় ঘোষণা। যে যে অবস্থায় আছো উঠে দাঁড়াও। সেলাম ঠোকো।

বীভৎস জীবন। নরক। অমানুষিক দুঃস্বপ্ন। তারায় ভরা আকাশের নীচে আর মেঠো আলের পথ দিয়ে চলতে চলতে সেটাকে অবিশ্বাস্য আর অসম্ভব ঘটনা বলে মনে হয়।

মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে আছে গ্রামগুলো। নীড়—স্বপ্ন দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে গড়া মানুষের ঘর। এখানে দুঃখ নিজের, ব্যথাও নিজের। প্রতি মুহূর্তে দুঃসহ অপমানের পীড়ন নেই। বাঞ্ছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে লাগল। অত্যন্ত খিদে পেয়েছে—মাথা ঘুরছে। ইচ্ছে করছে প্রতি মুহূর্তে পথের ওপর লুটিয়ে পড়তে—বুকের মধ্যে খানিকটা অবাধ বাতাস টেনে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে।

কিন্তু না— থামলে চলবে না। এখনো সামনে অনেক পথ বাকী—অনেক গ্রাম, অনেক মাঠ, দু'খানা হাটখোলা। একদিন এক রাত্রির রাস্তা। আর নিস্তারণ লোক ভালো—আসবার সময় আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে—ওই দিয়েই যা হয় খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

বাঞ্ছা জোর করে শক্তি সংহত করে নিলে শরীরে—দৃঢ় আর

দ্রুত পায়ে চলতে সুরু করে দিলে। মাঠের হাওয়ায় পাঁজরের টনটনে ব্যথাটা জুড়িয়ে আসছে—পায়ের তলায় কাঁটার তীক্ষ্ণ খোঁচাগুলো তেমন করে আর বিঁধছেনা। কিন্তু গ্রামগুলো এমন ঘুমন্ত কেন—একটা গানের কলি, জারি গানের একটি সুরও কোনখান থেকে ভেসে আসছেনা কেন! শুধু শেয়াল কুকুর ছাড়া দেশে আর মানুষ নেই নাকি! দূরে দূরে আলেয়া ছাড়া লণ্ঠন হাতে একটা লোকও চলছে না—দেড় বছরে বাংলা দেশ কি এতই ঘুম-কাতুরে হয়ে গেল!

এক দিন—এক রাত। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসছে। বাঞ্ছা এসে দাঁড়ালো মঙ্গলরাড়ীর মাঠের ধারে।

ওই তো গ্রাম। ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা পার হলেই বদন চৌকীদারের ঘর—তার শালা। কিন্তু এতক্ষণে বাঞ্ছার মনটা ভরে উঠল সংশয়ে। যাবে কি যাবে না।

পথে আসতে আসতে অনেক জিনিষই তার নজরে পড়েছে। নতুন রাস্তা হয়েছে যেখানে সেখানে—ঝক ঝকে তকতকে পাথর ফেলা রাস্তা। মাঝে মাঝে নতুন নতুন গ্রাম বসেছে। বড় বড় আটচালা, এক ইটের কোঠাঘর, টিউব-ওয়েল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটর সেই সব নতুন রাস্তা ধরে নতুন গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে। মিলিটারী কলোনী।

এই কি তার চেনা দেশ—দেড় বছর আগেকার দেশ? এখানকার মানুষগুলো কেমন করে কথা বলে! দু' পয়সা

দামের জিনিষ বারো পয়সা। তার দিকে ফিরেও কেউ তাকায় না। সকলের চোখ মাটির দিকে আর হলদে রঙের কুর্তিপরা সাদা কালো মিলিটারীদের দিকে। সে যেন এখানে অনাবশ্যক —যেন বিদেশে এসে পড়েছে কোথাও।

চেহারা বদলেছে পৃথিবীর—চেহারা বদলেছে মঙ্গলবাড়ীর! এখানেও মাঠের মধ্যে নতুন মিলিটারী উপনিবেশ। বিকৃত কণ্ঠের গান ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। দৈত্যের মতো বড় বড় চোখের আগুন ছড়িয়ে—পেট্রোলের গন্ধে চারদিক ভরিয়ে দিয়ে ছুটছে মোটর—যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ওই গ্রামে—ওই তেঁতুল গাছের ছায়ার নীচে বদন চৌকিদারের ঘরটা এখনো কি টিঁকে আছে! মল্লী কি বেঁচে আছে এখনো?

একটা অনিশ্চিত সন্দেহে বাঞ্ছার হাত পা কাঁপতে লাগল—বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসতে লাগল। যদি মল্লী মরে গিয়ে থাকে? যদি পথে ঘাটে ছড়ানো অসংখ্য নরমুণ্ড আর শুকনো পাঁজরের মধ্যে মিলিয়ে থাকে সেও? এই দেড় বছরের মধ্যে যে বাংলা দেশে মন্বন্তর বয়ে গেছে—সে খবর জানতে পেরেছে বাঞ্ছা। কে আছে আর কে যে নেই আজ তা অনুমান করাও শক্ত।

বাঞ্ছা অন্ধকারময় মঙ্গলবাড়ীর দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে সে, যাবে ওখানে? এতক্ষণে নিস্তারণের কথার অর্থটা তার কাছে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল:

এমন ভাবে না পালিয়ে জেলে থাকলেই ভালো করতিস্ বাঞ্ছা—

কিন্তু কতদিন মল্লীকে দেখেনি সে। তার মল্লী—সপ্তদশী সুন্দরী মল্লী। হালকা, চটুল। বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলে সাপের মতো পিছলে যায়। মল্লীকে বিয়ে করে নেশা ধরে গিয়েছিল তার—বাইরে বেরোনোর বদ অভ্যাসগুলো একরকম ভুলেই গিয়েছিল। প্রদীপের আলোয় নির্জন ঘরে মল্লীর সেই চোখ—সেই খিলখিল ক'রে হাসি !

বাঞ্ছার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। না—না—মরতেই পারেনা মল্লী। এমন সুন্দর—এমন অপরূপ। আত্ম-বিস্মৃতের মতো সে এগিয়ে চলল।

বদনের ঘর তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঠিক আছে। কোথাও এতটুকু রূপান্তর নেই তার। বরং বাড়ীটার শ্রী ফিরেছে আগেকার চাইতে। বাইরে নতুন দাওয়া—তাতে শালের খুঁটি। কয়েকটা ছোট বড় কাঠ আর বেতের বসবার আসন—বোঝা যাচ্ছে আগের চাইতে সামাজিক হয়েছে বদন।

কী বলে ডাক দেবে ভাবতে ভাবতে সামনের দরজাটা খুলে গেল আর সামনে এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে। হাতে তার প্রদীপ। মূহূর্তে বাঞ্ছা বিমূঢ় আর আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। সুন্দরী তরুণী মেয়ে। রঙীন শাড়ী পরা—মুখে প্রসাধনের চিহ্ন, যেন রূপকথার রাজকন্যার মতো সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বাঞ্ছা

কী বলবে ভেবে পেল না, শুধু গলা দিয়ে একটা অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল।

মেয়েটি চমকে গেল। হাতের প্রদীপটা তুলে ধরে বললে, কে?

—আ—আমি। বাঞ্ছার স্বর জড়িয়ে আসতে লাগল।

—আমি কে? মেয়েটির গলার স্বর কঠিন।

—আমি—আমি বাঞ্ছা। আমাকে চিনতে পারছিস না মল্লী?

—অ্যাঃ!

মল্লী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল, তার হাত কাঁপতে লাগল, কাঁপতে লাগল তার হাতের প্রদীপের শিখাটা। যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে দু'জনে। বিমূঢ় বিহ্বল বাঞ্ছা ভাবতে লাগল: মল্লী কী জানতে পেরেছিল আজ সে আসবে—তারই জন্যে প্রতীক্ষা করছিল এমন ভাবে—তাকে বুকের ভিতরে টেনে নেবে বলে? কিন্তু মল্লীর চোখমুখ দেখে তাতো মনে হওয়ার উপায় নেই।

আর মল্লীর যেন বাকরোধ হয়ে গেছে। স্বামীকে দেখছেনা—দেখছে একটা প্রেত-মূর্তি। মুখের ওপর ভয় আর সঙ্কোচের ছায়া নিবিড় হয়ে নেমে এল তার।

মল্লীর ঠোঁটই আগে নড়ে উঠল।

—ভিতরে এসো।

ঘরে ঢুকে মল্লীও দরজা বন্ধ করে দিলে। কিন্তু বাঞ্ছার আর বাকস্ফূর্তি নেই। এ কার ঘর! খাটের ওপরে পুরু করে বিছানা পাতা—তাতে ধবধবে চাদর। একটা ছোট টেবিলে এক টিন সিগারেট, দেশলাই। পেটমোটা রূপোর সিলকরা বোতল, গেলাস। বাঞ্ছা স্বপ্ন দেখছে নাকি?

—এ ঘর তোমার!

—হাঁ আমার।

—কিন্তু এসব পেলে কোথায়? কী এ সমস্ত?

সে কথার কোনো জবাব দিলে না মল্লী। বললে, পরশু রাতে তুমি পালিয়েছ শহরের জেল থেকে?

—হুঁ!

—এখানে খবর এসেছে। দাদার মতিগতি খারাপ—তোমাকে দেখলেই ধরিয়ে দেবে। এখনি পালাও।

—ধরিয়ে দেবে! পালাব? কেন?

—কেন? মল্লী হাসল—হাসিটা কান্না না একটা বীভৎস মুখভঙ্গী?—বুঝতে পারছ না এখনো? দেখে আসোনি মিলিটারীদের আস্তানা? ঘরের চেহারা দেখছ না? বুঝতে পারো না এতবড় আকালে আমরা বেঁচে আছি কী করে—রাজার হালে আছি?

রূপকথার গল্পে ডাইনির চুলের ছোঁয়ায় পাথর হয়ে গিয়েছিল রাজপুত্র। বাঞ্ছার গায়েও যেন সেই ডাইনির সাপের

মতো চুলের ছোবল লেগেছে এসে। পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত যেন হিম হয়ে আসছে তার—যেন জমে যাচ্ছে। শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে সে দেখছে কী চমৎকার সাজানো ঘরখানা। রাজবাড়ীর মতো বিছানা—রাজকন্যার মতো সেজেছে মল্লী। তার গায়ের থেকে আসছে পাউডারের গন্ধ। টেবিলে দেশলাই—সিগারেট, মদের বোতল, গ্লাস। যুদ্ধার্থী বীরের জন্য প্রেম মাল্য নিয়ে প্রতীক্ষা করছে বীর-ভোগ্যা সুন্দরী নারী।

বাইরে নাগ্ড়া জুতোর শব্দ। মল্লীর মুখ পাংশু হয়ে গেল।

হাঁক দিলে বদন চৌকীদার।—মল্লী!

পাণ্ডুর মুখে মল্লী জবাব দিলে, উঁঃ?

—ঘরে লোক আছে?

—হুঁ। এক মুহূর্ত বাঞ্ছার বলির পশুর মত চেহারাটার দিকে তাকালো সে। তারপর জবাব দিলেঃ সায়েব এসেছে।

—আচ্ছা—

পায়ের নাগড়া জুতো মচমচিয়ে বদন বেরিয়ে গেল।

আজ আর মল্লীর পরিচয় বাঞ্ছার স্ত্রী হিসেবে নয়। মিলিটারীদের গণিকা সে—বদনের উপজীবিকা, স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা। এত বড় পৃথিবী—মুক্ত পৃথিবী—তারায়ভরা আকাশ, নিঃসীম দিগ্‌দিগন্ত। কিন্তু বাঞ্ছার স্থান কোথায়, আশ্রয় কোথায়? চারদিক থেকে কঠিন ফাঁসির দড়ি তার গলায়

আটকে পড়বার জন্য এগিয়ে আসছে—চারদিকের পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসছে—জেলখানার ষাঁড়ের কুঁজ তোলা পাঁচিলের চাইতেও আরো—আরো—আরো সংকীর্ণ।

অন্ধকারের মধ্যে মাঠ ভেঙে ছুটেছে বাঞ্ছা। কে যেন তাকে পেছনে পেছনে তাড়া করে আসছে। পুলিস নয়—চৌকীদার নয়। তারায় ভরা আকাশ—সীমাহীন পৃথিবী—অসীম মুক্তিই আজ তাকে গ্রাস করতে চায়—হত্যা করতে চায়।

থানায় গিয়ে ধরা দেবে সে। বলবেঃ দয়া করো, দয়া করো আমাকে। জেলে পাঠিয়ে দাও। পাঁচ বছর নয়, দশ বছর নয়—যাবজ্জীবন। দ্বীপান্তর। কালাপানির ওপারে—যেখানে সমুদ্র—যেখানে এতবড় পৃথিবীটা কারো শক্ত হাতের মুঠির মতো ছোটো হয়ে গেছে।

বারো সরিকের বিল

নামটা পুরোনো—পঞ্চাশ, ষাট হয়তো বা একশো বছর আগেকার। কিন্তু বারো সরিক এখন বায়াত্তর সরিকে দাঁড়িয়েছে, দু'চারঘর বেশি ছাড়া কম নয়।

ঢালু মাটির বুকে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বিস্তীর্ণ হ'য়ে আছে এই জলাধার। কোথাও কোথাও মাথা তু'লেছে দীর্ঘ সবুজ হোগলার বন, বিলের জলে দোলা লাগলে তারা মর্মরিত হ'য়ে ওঠে। কোথাও বা পানা আর কচুরি এমনভাবে ঘন হ'য়ে আছে যে তার ওপরে দু'জন মানুষ নির্ভয়ে আর অসংকোচে উঠে দাঁড়াতে পারে। পানা সরবে না, নড়বে না এতটুকু : আদিম মহাসমুদ্রের বুকে মাটির প্রথম পত্তনির মতো।

বারো সরিকের বিল। বারো ঘর গোয়ালা ছিল এই বিলের মালিক। তখন বিল ছিল ভরা—বাতাসে ঢেউ তুলে রাশি রাশি জল দিকে দিকে খেলা ক'রে যেত। অথই-অকূল-উদ্দাম। জলের কোল ঘেঁষে চলেছে ঘাসের জমি। মখমলের মতো নরম ঘন সবুজ সতেজ ঘাস—মানুষের কোমর অবধি সে ঘাসের মধ্যে ডুবে যেত। আর বিস্তীর্ণ ঘাসের জমিতে চ'রে বেড়াত দলে দলে গোরু আর মহিষ। আকণ্ঠ আহারে

তাদের পেট দুপাশ দিয়ে ঝুলে পড়ত, দশ সের, পনের সের, আধ মণ করে দুধ দিত তারা। সেই দুধ যারা খেত, তাদের কালো শরীর চক্ চক্ ক'রে উঠত স্বাস্থ্যের আলোতে, তাদের পেশীতে পেশীতে দুলে উঠত শক্তির তরঙ্গ। উন্মুক্ত উদার প্রকৃতির বুকে উন্মুক্ত উদার মাটির মানুষ।

কিন্তু রাত্রির ইতিহাস আলাদা। তখন বিলের বুকে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত বত্রিশ দাঁড়ের নৌকা—অন্ধকারেও যাদের চোখ জানোয়ারের মতো জ্বলে, সেই মানুষ শিকারীর দল। দূরান্ত বিকীর্ণ তমসার ভেতর থেকে একটা আকস্মিক আর্তনাদ উঠেই আবার মিলিয়ে যেত ঝোড়ো হাওয়ার মতো বিলের উদ্দাম বাতাসে, জলের গন্ধের সঙ্গে মিশে যেত মানুষের রক্তের গন্ধ। দিনের বেলায় কে বলতে পারত ঠাণ্ডা কাদার নীচে লগি দিয়ে কোথায় কাকে পুঁতে দেওয়া হ'য়েছে—কোথায় অতল জলের নীচে তলিয়ে আছে যাত্রীবাহী নৌকো।

সীমানাহীন আকাশের তলায় আদিম আর অবাধ পৃথিবী। বারো সরিকের বিলে সৃষ্টির প্রথম সমুদ্রের তরঙ্গ-কল্লোল।

তারপরে কতদিন কেটে গেল। পঞ্চাশ-ষাট-একশো বছর। শ্যাওলা, পানা, আর আবর্জনার স্তূপ জমল এখানে ওখানে—প্রথম সমুদ্রের অসীমতা সীমা-সংকীর্ণ হ'য়ে এল ক্রমে ক্রমে। পৃথিবীর বয়স বাড়ল, শুকিয়ে এল মাটির তলাকার অকৃপণ রসসঞ্চয়। বিবর্ণ রক্তাভ বিচ্ছিন্ন ঘাসের জমিতে যারা

চ'রে বেড়ায়, তাদের হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে, পিঠের ওপরে তলোয়ারের মতো খাড়া হ'য়ে আছে মেরুদণ্ডের হাড়। একসের হু'সেরের বেশি হুধ দিতে পারে না তারা। ম্যালেরিয়া-জীর্ণ মানুষগুলো চলাচলতি করতেও হুর্বল বোধ করে। রাত্রির বিলে মানুষ শিকারীদের দল শিকারের সঙ্গে সঙ্গেই বিলের কাদার নীচে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

বারো সরিকের বিলের মালিক বায়াত্তর সরিক। কিন্তু কি লাভ মালিকানা দিয়ে! বর্ষার পরে কিছু কিছু মাছ পাওয়া যায়, হু'চারদিন বিক্রি হয় বাজারে। তারপর পানার স্তূপ আরো ঘন হ'য়ে আসে, এখাসে ওখানে কর্দমাক্ত ডাঙ্গা জেগে ওঠে। পচা জলের হুর্গন্ধ ছড়ায়, ম্যালেরিয়া আসে, কলেরা আসে। বায়াত্তর সরিকের ঘরে কান্নার রোল অঠে। যে বিল একদিন মানুষের জীবনে সঞ্চার করত অমিত স্বাস্থ্য, অপরিমেয় জীবন—আজকে তাই মানুষের মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গোয়ালাদের তেল পাকানো দশ হাত লাঠি আজ ছাগল চরানো পাঁচন বাড়ীতে রূপান্তর নিয়েছে। নিজেদের অধিকার নিজের জোরেই যেদিন তারা সাব্যস্ত করত সেদিন আর নেই। উকিল এসেছে, আইন এসেছে, সহরের আদালত এসেছে। সভ্যতার আলোকলাভে ধন্য হয়েছে গোয়ালারা। খালি গায়ে জামা উঠেছে, পায়ে জুতো এসেছে। স্বাস্থ্য, শক্তি

আর জীবনের মূল্য দিয়ে যুগ-সভ্যতার জগতে তারা প্রবেশের অধিকার পেয়েছে।—

গঙ্গাধর ঘোষের ছোট ছেলেটা ক'দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠল। বাঁচবার আশাই ছিল না, তবু কোনক্রমে ঠেলে উঠেছে এ যাত্রায়। বারো বছরের ছেলে, কিন্তু অসুখে এমন ক'রে ফেলেছে যে পাঁচ বছরের বেশি বলে তাকে মনেই হয় না। ন্যাড়া মাথা, গলায় তামার মাদুলি। অস্থিসার হাত-পাগুলো দাপাদাপি ক'রে সে প্রাণপণে চীৎকার করছিল।

গঙ্গাধর বাড়ীতে ঢুকল। কাঁধ থেকে বাঁকটা নামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বসল দাওয়ায়। টপ টপ ক'রে ঘাম পড়ছে কপাল দিয়ে—বড় পরিশ্রম হ'য়েছে।

—এই পাঁচু, চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

এক মুহূর্ত্ত কান্না বন্ধ ক'রে পাঁচু গঙ্গাধরের দিকে তাকাল। তারপর আবার চীৎকার জুড়ে দিলে দ্বিগুণ।

—খালি খালি চেঁচিয়ে মরছিস, হয়েছে কি?

এইবারে ঘর থেকে বেরিয়ে এল চাঁপা। বললে: ভাত খাবে।

—ভাত খাবে? কাল জ্বর ছাড়ল, আজই ভাত খাবে কি রকম?

—তবে কী খাবে?—অত্যন্ত নিরীহ স্বরে প্রশ্ন করলে চাঁপা।

—ভাত নিশ্চয় খাবে না। কবিরাজ কী ব'লে গেছে খেয়াল আছে?

—কিন্তু কবিরাজ তো সাবু খাওয়াতে ব'লে গেছে।

—সাবু! আহা মরে যাইরে!—গঙ্গাধর একটা ভ্রুভঙ্গী ক'রলে বিকটভাবে : সাবু খাবে? কেন সোণার দানা খেতে চাইলেই তো পারে। পাঁচ টাকা সাবুর সের—রাজা-রাজড়ার খোরাক। পেটে কিল মেরে শুইয়ে রাখো গে।

—না খেয়ে যদি মরে, তাহলে তার চেয়ে ভাত খেয়ে মরাই ভালো।

—খবর্দার, খবর্দার চাঁপা।—হঠাৎ গর্জে উঠল গঙ্গাধর : খেপিয়ে দিসনে আমাকে। মুখে মুখে তকরার করবিনে।

—কিন্তু ছেলেটাকে তো খেতে দিতে হবে।

—হুঁ।—গঙ্গাধর ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রইল খানিকক্ষণ। খেতে দিতে হবে ছেলেটাকে। কিন্তু কেন খেতে দিতে হবে, কেন খেতে চাইবে ছেলেটা! কত মানুষ তো না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেল—তিলে তিলে মরে গেল গঙ্গাধরের চোখের সামনেই। কে তাদের খেতে দিয়েছে? আর গঙ্গাধরই বা এমন কি অপরাধ করেছে যে পাঁচুকে দু'বেলা দু'থালা ক'রে অন্ন যোগাতেই হবে তার?

চাঁপা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'রলে, তা' হলে কী খাবে?

—জানি না আমি।

গঙ্গাধর বীরের মতো উঠে পড়ল। বাঁকটা হাতে তুলে নিলে, যেন দিগ্বিজয়ে যাচ্ছে কোথাও। তারপর রাজকীয়ভাবে বলে গেল: ভাত খেতে দিয়ো না, এই আমি বলে গেলাম। যদি ভাত দাও রক্তারক্তি হ'য়ে যাবে।

গঙ্গাধরের গতিপথের দিকে খানিকক্ষণ নির্ণিমেষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চাঁপা। পাঁচু আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদছে, ছোট ন্যাড়া মাথাটা ক্রমাগত ঠুকছে দরজার চৌকাটের ওপর। কপালের ওপর লেবুর মতো গোল হ'য়ে খানিকটা জায়গা ফুলে উঠেছে, আর চীৎকারের স্বরটা চড়ছে পর্দায় পর্দায়। অতটুকু ছেলের গলায় কী প্রচণ্ড আর্তনাদ! যেন জীবনী-শক্তির শেষ রেশটুকু গিয়ে তার কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছে।

অসহায় ক্রোধে ছেলেটার পিঠে গোটা তিনেক সশব্দ চড় বসালো চাঁপা। কাল রাত থেকে তারও একটু একটু জ্বর হ'য়েছে—এসব ঝামেলা সহ্য করবার মতো শরীর কিংবা মনের অবস্থা তার নয়। দাঁতের ভেতরে চাপা গর্জন করে বললে: মর মর। তুইও বাঁচ, আমারও হাড় জুড়োক। পা ধরে বিলের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসব—নিশ্চিন্দি একেবারে।

পাঁচুকে ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে বাইরে থেকে চাঁপা শিকল টেনে দিলে। ভেতর থেকে আর্ত চীৎকার আসছে সমানে, কিন্তু সামনে নেই বলে অমন তীব্র ভাবে কানে বিঁধছে না।

কাঁদুক, যত খুশি কাঁদুক। ভগবান যার নেই, সংসারে তার মুখের দিকে কে তাকায়?

কিন্তু এতক্ষণে চোখের কোণায় কোণায় জল নেমে এল। গঙ্গাধরের মনের ভাবটা বুঝতে পেরেছে চাঁপা। কবিরাজের কথার ওপরে এমন অচলা বিশ্বাস কবে ছিল গঙ্গাধরের? নিজে যখন জ্বরে পড়েছে তখন এ-সব বিধিনিষেধ কখনো তার মনে থাকেনি। সারা গা' আগুনের মতো পুড়ে যাচ্ছে—রক্তমাখা চোখ দু'টো জ্বলছে—টলতে টলতে গঙ্গাধর উঠে গেছে রান্নাঘরের দিকে। কাঁসিতে ভাতে আর জলে এক রাশ ঢেলে নিয়ে গোগ্রাসে গিলেছে আর ছড়িয়েছে ছেলে মানুষের মতো। কিন্তু সেই ধুম জ্বরের ওপর অতগুলো পান্তা খেয়েও গঙ্গাধরের কিছু হয়নি, তিনদিন বাদে আবার ঠেলে উঠেছে, নির্বিকারভাবে বাঁক দিয়ে ঠেঙ্গিয়েছে চাঁপাকে। আর পাঁচুর বেলায় অমন কবিরাজভক্তি কী কারণে উথলে উঠল তার?

কারণটা স্পষ্ট। চালের বাজারে টান ধরেছে। আধি চাষ করে যা জুটেছিল, তার সঞ্চয় ক্ষীণ হ'য়ে আসছে দিনের পর দিন। মহাজনের কাছে চাল সহজে পাওয়া যায় না—যা পাওয়া যায় তার দামও আগুন। কাল বাদে কী হবে এক ভগবান ছাড়া কেউ বলতে পারে না!

গঙ্গাধর চায় চাল বাঁচুক। কতখানি চালের ভাত খায় পাঁচু? আধ পো—এক পো? গরীবের সংসারে তাই বা কম কী?

তিনদিন ছেলেটাকে উপোস করিয়ে রাখলে গঙ্গাধরের এক বেলার সাশ্রয় হ'য়ে যাবে। আর মরে গেলে তো কথাই নেই —একেবারে পাকাপাকিভাবে নিশ্চিন্ত। আর শুধু পাঁচু কেন, সেই সঙ্গে মরতে পারে না চাঁপাও? হাত-পা ঝেড়ে সাফ হ'য়ে বসতে পারে গঙ্গাধর। যতই আকাল আসুক না কেন, একটা একলা পেট গঙ্গাধর চালিয়ে নিতে পারবেই।

ঘরের ভেতর ছেলেটার কান্না আর শোনা যাচ্ছে না। মরে গেছে নাকি? না—গরীবের ছেলে অত সহজেই মরেনা, অমন কপাল করে আসেনি চাঁপা। কাঁদতে কাঁদতে বেদম হ'য়ে পড়েছে নিশ্চয়। চোখের জল মুছে ঘরের আড়ার দিকে চাঁপা একবার তাকালো। পরনের শাড়ীখানা গলায় বেঁধে ওখান থেকে ঝুলে পড়লে মরতে কতক্ষণ লাগে?

বার সরিকের বিল থেকে বাতাস আসছে। দামের গন্ধ, পচা পানা আর কচুরির গন্ধ—জমাট পাঁকের গন্ধ। ওই গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে বার্তা বয়ে আনছে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া। বায়াত্তর সরিকের ঘরে ঘরে যমরাজের পরোয়ানা। পৃথিবীর অনেকখানি জুড়ে একটা বিরাট অপচয়—বৈশাখের উত্তপ্ত আকাশের নীচে যেন টগবগ ক'রে ফুটছে বিশাল একটা নরককুণ্ড।

বাড়ী থেকে হন হন ক'রে বেরোল গঙ্গাধর। বিস্বাদ আর বিরক্ত মন। বাড়ীতে এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করেনা।

অসহ্য লাগে পাঁচুকে—আরো বেশী অসহ্য মনে হয় চাঁপাকে। পাঁচুর কান্না সহ্য হয় না, কিন্তু একটা বিরাট চড় কশিয়ে দম ধরিয়ে দেওয়া যায় তাকে। কিন্তু আস্তে আস্তে কথা বলে চাঁপা, কখনো বা নীরবে নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ওই নীরবতা, ওই দৃষ্টি গঙ্গাধরের গায়ে বিষের ছুরির মতো বেঁধে। এর চাইতে চাঁপা যদি খাণ্ডারের মত চীৎকার করত, গাছ-কোমর বেঁধে সাতপুরুষ তুলে গালিগালাজ ক'রত গঙ্গাধরের, অনেক সুসহ মনে হত সেটা। কিন্তু কিছুই বলে না চাঁপা—শুধু অদ্ভুত ভাবে তাকায়। গঙ্গাধর নিজেকে অনুভব করে চরম লাঞ্ছিত—চূড়ান্ত অপমানিত। যেন পৃথিবীর যা-কিছু অভিযোগ—যা-কিছু ধিক্কার চাঁপার দৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হ'য়ে পড়েছে।

কী দোষ করেছে গঙ্গাধর? কী অপরাধ করেছে সে পৃথিবীর কাছে? বিলের জল থেকে—দুর্গন্ধ কচুরি পানার দাম থেকে এই যে মহামারীর এক একটা তরঙ্গ বছর বছর উঠে আসছে এর জন্যে কি সে দায়ী? বাজার থেকে দিনের পর দিন চাল'যে উধাও হ'য়ে যাচ্ছে—মানুষ যে এক বেলা খেয়ে দিন কাটাচ্ছে তার জন্যে সে কি অপরাধী? চাঁপার পরণের কাপড় জোটাতে পারে না—কিন্তু সে কি একান্ত ভাবে তারই দোষে?

তবু কেন অমনভাবে তাকাবে চাঁপা—অমন ক'রে রক্তের মধ্যে জ্বালা ধরিয়ে দেবে গঙ্গাধরের?

—অমন হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছিস কেন?

—কী করে তাকাবো তবে ? এর চাইতে ভালো চোখ তো ভগবান দেননি।

—নাঃ, ভগবান দেননি ? গঙ্গাধর জানোয়ারের মতো খিঁচিয়ে উঠেছে : তুই কক্ষণো আমার দিকে তাকাবিনা। মাথা নীচু করে বসে থাকবি।

—তাই থাকব।

ব্যাস—চাঁপা একেবারে নীরব। কিন্তু গঙ্গাধরের মনে হয় —অসহ্য ক্ষোভ আর নিরুপায় বিরক্তিতে মনে হয়, নিজের বুক চাপড়ে সে পাগলের মতো কেঁদে উঠবে, না বাঁকের ঘা বসিয়ে দু' ফাঁক করে দেবে চাঁপার মাথাটা ? চীৎকার করে কেন ঝগড়া করলনা চাঁপা, কেন তীব্রভাবে প্রতিবাদ করল না ? তাহলে গঙ্গাধর যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচত—বেঁচে যেত ওই নীরবতা আর অপলক দৃষ্টির অভিশাপ থেকে। মাঝে মাঝে গঙ্গাধর ভাবে চাঁপা বেঁচে নেই—ও মানুষ নয় যেন। যেন কোথা থেকে একটা প্রেতিনী উঠে এসে ওর দেহের ওপরে ভর করেছে।

—ও গঙ্গাদা, শোনো শোনো।

গঙ্গাধর থেমে দাঁড়ালো। রামহরি ঘোষের ছেলে নীলমাধব তাকে ডাক দিয়েছে।

বিরক্তমুখে গঙ্গাধর বললে : ডাকছিলে কেন ?

—এই সাত সকালে এমন করে কোথায় চলেছ ?

—কাজে। কি বলছিলে বলো, আমার সময় নেই।

নীলমাধব হাসল: বিশু কাকার গাঁজার আড্ডায় চলেছ তো? কিন্তু নেশা-ভাং গুলো এখন ছাড়ো গঙ্গাদা, বয়েস তো কম হলনা নেহাৎ।

দু'চোখে আগুন বৃষ্টি ক'রে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল গঙ্গাধর।

নীলমাধব এগিয়ে এল। একখানা হাত চেপে ধরলে গঙ্গাধরের। বললে, রাগ কোরোনা গঙ্গাদা—একটু দাঁড়িয়ে যাও। সত্যি দুটো দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

দাঁড়াতেই হল। নীলমাধবের অনুরোধ ঠেলে যাওয়া যায় না। রামহরি ঘোষ গরীব, এমন কি গঙ্গাধরের চাইতেও গরীব। তবু এই ছেলেটি তার রত্ন। বাপের পয়সায় নয়, নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া করে বৃত্তি পেয়েছে, এখন কলেজে পড়তে গেছে শহরে। কেবল নিজের পড়ার খরচা যে চালিয়ে নেয় তাই নয়, বাপকেও খাইয়ে রাখছে সে। বায়াত্তর সরিকের ঘরে এই একটি মাত্র ছেলেই সরস্বতীর আশীর্বাদ পেয়েছে। গয়লাপাড়ার দেড়শো বছরের পুরোনো সুর বাঁধা অভ্যস্ত জীবনে একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। বয়েস কম, তবু গাঁয়ের বুড়োরা তার কথাবার্তা শোনে, মান্য করে তাকে।

পথের পাশে বড় অশ্বথ গাছটার তলায় গোল হয়ে ঠাণ্ডা ছায়া পড়েছে। পাতায় পাতায় মিষ্টি হাওয়া দিয়ে যাচ্ছে

নীলমাধব বললে, এসো, একটু বসা যাক। ভয় নেই, বেশিক্ষণ তোমাকে আটকে রাখব না।

বিরক্তির সঙ্গে খানিকটা বিস্ময় এসে গঙ্গাধরের মনটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। কী কথা নীলমাধব বলতে চায় তাকে? সে নিজে নেশাখোর মানুষ—গয়লা পাড়াতেও কিছু পরিমাণে অস্পৃশ্য। নীলমাধবের মতো ছেলে—গয়লাপাড়ার রত্নবিশেষ—তার সঙ্গে কী আলোচনা সে করতে চায়? অদূরে একটা ভাঙা উনুনের চাপ চাপ পোড়া আর কালো মাটির দিকে তাকিয়ে গঙ্গাধর চুপ করে বসে রইল।

—বলছিলাম বিলের কথা।

—বিল?

—হুঁ। দেখতেই পাচ্ছ কারো কোনো কাজে লাগবে না। বানের সময় সামান্য যা মাছ পাওয়া যায় তাতে বায়াত্তর সরিকের ঘরে ঘরে এক মাসেরও খোরাক ওঠে না। অথচ জল টেনে গেলে পাঁকের গন্ধ ওঠে, মশা জন্মায়, ছত্রিশ রকমের অসুখ বিসুখ ছড়িয়ে যায়।

—হুঁ! গঙ্গাধর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালো নীলমাধবের দিকে, তা কী করতে হবে?

—সেই কথাই বলছি। নীলমাধবের চোখ দুটো উৎসাহিত আলোয় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠছে।—অথচ দেখতে পাচ্ছ—অতখানি জমি একেবারে বেদরকারী হয়ে পড়ে আছে। শুধু তাই নয়

মানুষ মারা কল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাকে যদি অন্য কাজে লাগানো যায় ?

—কী কাজে ?

এবার আর গঙ্গাধর বাঁকা চোখে তাকালো না—সোজা সন্দেহ-কুটিল দৃষ্টিটা এনে নীলমাধবের মুখের উপর ফেলল। ব্যাপারটার মধ্যে অন্য রকমের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মতলব কী ?

—কাজ আর কিছুই নয়। এখন তো বোশেখ মাস, বিলের দশ আনি জায়গাই শুকিয়ে পড়ে আছে। এই ফাঁকে আমরা বিলে বাঁধ দিয়ে ফেলি।

—বাঁধ ?

—হ্যাঁ, বাঁধ। বিল ছোট করে দিয়ে ধানের জমি করে নিই।

—কী বললে ! গঙ্গাধর বিদ্যুৎ চমকের মত দাঁড়িয়ে পড়ল, বলছ কী তুমি ?

নীলমাধব এবার দুহাতে গঙ্গাধরের হাত আঁকড়ে ধরল, শোনো, শোনো গঙ্গাদা, কথাটা মন দিয়ে শোনো। এতে ভালোই হবে। যা মাটি, লাঙলও দিতে হবে না, শুধু ধান ছড়িয়ে গেলেই সোনা ফলবে। পাঁচ সের মাছের বদলে দশ মণ ধান পাবে তুমি—গাঁয়ের শ্রী বদলে—

কিন্তু কথাটা শেষ হতে পেল না। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গঙ্গাধর ছিটকে বেরিয়ে গেল, বাঘের মতো গর্জে

বললে, ওসব কলেজে পড়া চালাকি এখানে করতে এসো না, বুঝেছ? বিলে এক ছটাক দখল নেই তোমার বাপের, তাই ভুলিয়ে ভালিয়ে সর্বনাশ করতে চাও আমাদের? খবর্দার! বিলে বাঁধ দেবার চেষ্টা যে করবে তার মাথা থাকবে না—এই বলে রাখলাম।

হন হন করে চলে গেল গঙ্গাধর। একবারও তাকালো না পেছন ফিরে। গাঁজার তৃষ্ণায় অন্তরাত্মা ছটফট করছে তার; বিশু কাকার আস্তানায় তিন চারটে ছিলিম বোধ হয় পার হয়ে গেল এতক্ষণে। নীলমাধবের পাল্লায় পড়েই এতখানি সময় নিতান্ত অপব্যয় হয়ে গেল তার। কলেজে এতদিন লেখাপড়া করে শেষে এই হল নীলমাধবের—গাঁয়ের লোকের মাথায় সে কাঁঠাল ভাঙতে চায়। কিন্তু চালাকি চলবে না—গঙ্গাধর লেখাপড়া শেখেনি, তবুও কত ধানে কত চাল হয়, সেটা তার অজানা নেই।

আর নীলমাধব অশ্বত্থের ছায়ায় তেমনি চুপ করেই বসে রইল। অপ্রত্যাশিত নয়—অস্বাভাবিকও নয়। যার কাছে কথাটা তুলেছে, তার কাছ থেকেই অভ্যর্থনা এসেছে এমনি ভাষায়, এর চাইতেও রূঢ়তর ভাবে। বারো সরিকের বিলে বায়াত্তর সরিকের জন্মগত অধিকার। তার আর কোন মূল্য নেই—কিন্তু মর্যাদার মূল্যকে অস্বীকার করবে কে? তা ছাড়া, তারা গোয়ালা, তারা যাদব। তাদের বংশপুরুষ নরোত্তম

কৃষ্ণ সুদর্শন ধারণ করে একদিন কুরুক্ষেত্রের রণ-প্রাঙ্গনে ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলেন—পাঞ্চজন্যের বজ্রনাদে আর্যাবর্ত-দাক্ষিণাত্যকে মন্দ্রিত করে তুলেছিলেন ; হলধর বলরামের অতুল শৌর্য খ্যাত ছিল স্বর্গে, মর্তে, পাতালে—তাঁর লাঙলের ফলার একটি আঘাতে সসাগরা পৃথিবীর নীচে বাসুকী নাগের সর্বাঙ্গ বেদনায় থর থর করে কেঁপে উঠত। দ্বারাবতী ছিল তাঁদের রাজধানী। তাঁদের বংশধর এরা, বারো সরিকের বিলে উত্তরাপথ-দক্ষিণাপথব্যাপী মহাসাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ। এমন গৌরব-সমৃদ্ধ যাদের অতীত, তারা কী করে ছেড়ে দেবে বিলের এই রাজমর্যাদা, কেমন করে তারা সাধারণ চাষার মতো জমিতে নেমে লাঙ্গল ঠেলবে ?

দূরে মরা বিল। ক্লেদ পঙ্কিল—দুর্গন্ধে ভরা। জলের মধ্যে অর্ধাঙ্গ ডুবিয়ে একটা গোরুর গলিত দেহ ভাসছে, তার ওপর উড়ে পড়ছে শকুন। কাল-বিধ্বস্ত দ্বারাবতীর মতো ঠাণ্ডা কাদার নীচে বহু মানুষের কঙ্কাল নিয়ে অভিশপ্ত বারো সরিকের বিল ছড়িয়ে পড়ে আছে।

বারো সরিকের বিলের চারদিকে দুর্দিন ঘন হয়ে এল।

একদিন কী কালব্যাধি এসে বিষ বিস্তার করলে সারা দেশে—গোয়ালাদের গোরুগুলো টপাটপ করে মরতে সুরু করে দিলে। দু দিন চুপ করে থাকে, ঘাস বিচালি খায় না, শুধু চোখের কোণ দিয়ে ময়লা জল গড়িয়ে পড়ে। তৃতীয় দিনে থর থর করে

কাঁপতে থাকে, তারপর হাত পা ছড়িয়ে আছড়ে পড়ে যায় মাটিতে। কাছে এসে দেখা যায় মরে কাঠ হয়ে গেছে।

বিলের দক্ষিণে ভাগাড়। শকুনের ভোজ সুরু হয় সেখানে। রাত্রে শেয়ালের দল পরমানন্দে ীৎকার করে, উল্কামুখীর মুখে আগুন দপ দপিয়ে ওঠে, পচা-গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। বিলের জল বিষের মতো কালো—কচুরি পানার স্তূপে গোখরো সাপ ডিম পাড়ে, রৌদ্রে পোড়া মাঠের ফাটল দিয়ে যেন বেরিয়ে আসে পৃথিবীর ভারক্লান্ত বাসুকী নাগের অগ্নি-নিঃশ্বাস।

গোয়ালারা প্রমাদ গণল। জমি-জমা কারো বিশেষ কিছু নেই—গোরুই ভরসা। দুধ দইয়ের জোগান দিয়ে এই দুঃসময়ে কোনোমতে দিন গুজরাণ চলছিল। কিন্তু আর উপায় নেই—মাথার উপর দিয়ে যেন বিধাতার মৃত্যুদণ্ড নেমে আসছে।

একটা করে গোরু মরে—গোয়ালাপাড়ায় হাহাকার ওঠে। প্রিয়জন বিয়োগের মতো ডুকরে ডুকরে বুকফাটা কাতর-কান্না। ধান নেই, চাল নেই—অনাহার-মৃত্যু অনিবার্য।

গোরুর কবিরাজ এল পাশের গ্রাম থেকে। লোহা পুড়িয়ে গোরুর গায়ে কালো কালো দাগ এঁকে দিলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। মড়কের অশ্রান্ত দাপটে পাড়ার গোরু উজাড় হয়ে গেল।

গঙ্গাধর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিলের দিকে। বারো সরিকের বিল—স্বাস্থ্য, শক্তি, প্রাচুর্যের অপরিমেয় উৎস

ছিল একদা। নতুন বর্ষার জলে সাগরের মতো দুলে উঠত—সতেজ শ্যামলতার উল্লাসে বাতাসে ঘাসের বন মাতামাতি করত।

গোরুর বাঁট থেকে দুধ পড়ত না—নেমে আসত ক্ষীরের ধারা।

সেই বিল। বিষের মতো কালো। বিবর্ণ লাল্‌চে মরা ঘাস—যেন আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে কেউ। দক্ষিণ পাড়ের ভাগাড়ে মরা গরুর হাড় স্তূপাকারে জমে উঠছে। বায়াত্তর সরিকের ঘরে বারোশো মানুষের উতরোল কান্না। নিরুপায় ক্ষোভে—আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকায়।

মাঝে মাঝে নীলমাধবের কথা মনে পড়ে।

—এই বিলে বাঁধ দিয়ে ধান ছড়িয়ে দাও গঙ্গাদা। যা মাটি—দু দিন পরে সোনা ফলবে—কিন্তু ভাবতেই অন্তরাত্মা চমক খেয়ে ওঠে। মরা রক্তে আগুন ধরে যায়। তারা যাদব—সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণের বংশধর। দুধ ক্ষীর তৈরী করেছে—পেট ভরে খেয়ে যা বাড়তি হয়েছে তাই বিক্রি করেছে বাজারে। কালো কঠিন শরীরে নেচে ফিরেছে শক্তির তরঙ্গ। সখ করে বাবরী রেখেছে—বিলের ধারে বিস্তীর্ণ ঘাসের জমিতে অন্ধকার রাত্রিতে মশাল জ্বেলে লাঠি খেলেছে। হৈ—হৈ—হায়। লাঠিতে লাঠিতে ঠকাঠক শব্দ—বীরের সঙ্গে বীরের সংগ্রাম। লোহার আংটা পরানো আট হাতি লাঠির মুখ থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

তারপর রাত গভীর হয়েছে। বিলের বুকে নৈশ-অভিযান। লাঠি খেলার সার্থক পরিচয় দেবার অবকাশ। কোথায় গেল সে সব! গঙ্গাধরের ছেলেবেলার অস্পষ্ট স্মৃতিকেও মনে হয় সুদূর একটা স্বপ্নের মতো। আর আজ?

তবু কি বাঁধ দিতেই হবে বিলে? ধান নেই—চাল নেই। দু দিন থেকে উপোস করছে চাঁপা। আগেকার দিনের পচা পান্তা খেয়ে আবার জ্বরে পড়েছে পাঁচু। এবার আর বাঁচবে না। মরে যাক্—সেই ভালো। বাঁচবার কোন উপায়ই যার নেই, বেঁচে থাকবার জন্যে তার এই বিড়ম্বনা কেন?

রাঙী গাইটাও মরে গেল। গঙ্গাধরের শেষ আশ্রয়। ঘরের দরজায় পাথরের মূর্তির মতো বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে বসে আছে চাঁপা—যেন তার কাঁদবারও সামর্থ্য নেই। আর আশ্চর্য —এতবড় সর্বনাশের পরে গঙ্গাধর উঠে দাঁড়াল—গোরুটার পেছনের পায়ে দড়ি বাঁধলে, টেনে নিয়ে চলল ভাগাড়ে ফেলে দেবার জন্যে—যেখানে গোয়ালাপাড়ার বুকের পাঁজরগুলো রাশি রাশি গলিত মাংস জড়ানো কঙ্কালে বিকীর্ণ হয়ে আছে কঠিন ফাটল ধরা মাটিতে।

শুকিয়ে অস্থিসার হয়ে গেছে—তবু কী ভারী গোরুটা। টানতে গিয়ে যেন হাতের ডানা ছিঁড়ে যায়। লটপটে ঘাড়টা যেন মাটীকে অন্তিম চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে, বাঁকা শিং দুটো আটকে যায় গুচ্ছ গুচ্ছ ঘাসের গোড়ায় গোড়ায়। যে মাটি থেকে

এতদিন গোরুটা সঞ্চয় করেছে প্রাণ—সংগ্রহ করেছে খাদ্য, আজ যেন কি একটা অপরিসীম মমতায় এই মাটিকে সে ছাড়তে চাচ্ছে না।

কী অসম্ভব ভারী! অথবা এক মাসের অর্ধাহার আর এক দিনের অনাহারেই গঙ্গাধর এত দুর্বল হয়ে পড়েছে! বিশু খুড়োর আড্ডায় গাঁজা বন্ধ। পেটের ভাত নেই—গাঁজার প্রশ্ন তো এখন ওঠেই না।

কিন্তু গোরুটা কি পাথর খেয়েছিল মরবার আগে? বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে গঙ্গাধর থেমে দাঁড়ালো। বুকের ভেতরে কে যেন ক্রমাগত একটা হাপর টেনে চলেছে। এত কষ্ট হচ্ছে গঙ্গাধরের—দম আটকে আসছে যেন। টের পেল, কপাল থেকে গাল বেয়ে গড়িয়ে নোনা ঘামের ফোঁটা তার মুখে এসে পড়ছে।

এতক্ষণে চাঁপার পাষাণ মূর্তিটা প্রাণ পেয়েছে কি? এতক্ষণে কি বুঝতে পেরেছে—মাথায় আকাশ ভেঙে নেমেছে ওদের? বিলের দুর্গন্ধ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কান্না ভেসে আসছে, ওরে আমার রাঙী রে—আমার সোণার রাঙী—

সোণার রাঙী—তাই বটে। নিজের হাতে, সন্তানের চাইতেও অনেক বেশি যত্নে রাঙীকে বড় করে তুলেছিল চাঁপা। গোপাষ্টমীর দিন। এই দিনে শ্রীকৃষ্ণকে মা যশোদা ননী-ছানা খাইয়ে পীত-ধটি পরিয়ে, হাতে মোহন বাঁশী আর পাঁচনবাড়ী

দিয়ে গো-চারণে পাঠিয়েছিলেন। শ্যামলী ধবলীর হাম্বারবে বৃন্দাবন মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই দিনটির কথা মনে করে আনন্দে আর ভক্তিতে চাঁপার চোখ চক চক করে উঠত। রাঙীর কপালে পরিয়ে দিত সিন্দুরের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা। পাঁচু আও বড় হবে—তারপর রাঙীকে চরাতে নিয়ে যাবে মাঠে। কে বলতে পারে তার ভেতরই যশোদা-দুলাল বালক শ্রীকৃষ্ণ লুকিয়ে আছে কি না।

তবু রাঙী মরে গেল। কেন মরে গেল? শুধু বিলের কালো জলেই নয়—বিবর্ণ লালচে ঘাসের মধ্যেও কি লুকিয়ে আছে অদৃশ্য মৃত্যু? মাটির তলা থেকে বাসুকী নাগের নিঃশ্বাস উঠে ঘাসগুলোকেও বিষদগ্ধ করে দিয়েছে?

চাঁপা কাঁদছে—চীৎকার করে কাঁদছে। গঙ্গাধরের বুকের মধ্য থেকে হাপরের টান উঠছে—কদিন যে পেট ভরে খাওয়া হয়নি তার। বুকে হাত চেপে মাটির ওপরে বসে পড়ল গঙ্গাধর।

দু'সের ধান সংগ্রহ করে কোত্থেকে আসছে ফকির ঘোষ। গঙ্গাধরকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল।

—কী হল গঙ্গা?

মরণাহত একটা জন্তুর মতো দু'টো বিহ্বল চোখ মেলে তাকালো গঙ্গাধর।

আমার রাঙীও মরে গেল ফকির ভাই। শেষ ভরসা ছিল এই গোরুটা—তাও গেল।

রাঙীও গেল। সব গেল—সব যাবে। সর্বনাশ শুধু গঙ্গাধরের একার নয়—বারো সরিকের গ্রামে বায়াত্তর সরিকের। ফকিরের চোখের কোণা চিক চিক করে উঠল।

—কাল থেকে ঘরে কিছু নেই, রোগা ছেলেটা না খেয়ে ঘরে পড়ে আছে। ভেবেছিলাম গোরুটা বিক্রি করে দেব, তবু—

সহানুভূতি জানাবার ভাষা এল না ফকিরের। বিলের কালো জলের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গঙ্গাধরের কাপড়ের খুঁটে সেরখানিক ধান ঢেলে দিয়ে বললে, আজকের দিনটা চালিয়ে নাও ভাই। পরে যা হয় ভগবান করবেন।

—তোমার ধান—আমাকে দিলে তুমি? বিস্মিত গঙ্গাধর তেমনি বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল।

—আমি একা মানুষ, যে করে হোক চালিয়ে নেবই। কিন্তু ছেলেপুলের ঘর তোমার—দরকার তো আমার চাইতে বেশি।

কৃতজ্ঞ গঙ্গাধর মাথা নীচু করে রইল। চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছে কঠিন মাটিতে। তারপর যখন মাথা তুলল, তখন ফকির নেই, চলে গেছে।

কিন্তু আর বসে থাকা চলে না। এই ধান নিয়ে যেতে হবে, সেদ্ধ করে চাল কুটে তবে এ বেলা রান্না চড়বে হাঁড়িতে। এতক্ষণে গঙ্গাধর টের পেলো অসহ্য ক্ষুধায় তার পেটের মধ্যে

আগুন জ্বলছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চায়, তবু উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে দড়িতে টান নিলে- -হেঁইয়ো—

—হেঁইয়ো—

রাঙী নড়ে না। পাথরের একটা প্রকাণ্ড চাঙারের মতো স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। হাতটা কাঁধ থেকে খসে যাচ্ছে গঙ্গাধরের, বুকের পাঁজরাটার ভেতরে পড়ছে যেন হাতুড়ির ঘা।

হেঁইয়ো—

চড়াৎ করে কী একটা যেন কোথায় ছিঁড়ে গেল! বাইরে নয়—গঙ্গাধরের বুকের মধ্যে। বারো সরিকের বিল থেকে বন্যার উচ্ছ্বাসে এক ঝলক কালো জল এসে যেন তার চারিদিক ঘিরে ফেলেছে—যেন সে কোন্ অতলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। জল—কালো দুর্গন্ধ জল। ডুবে যাচ্ছে গঙ্গাধর—মরে যাচ্ছে। বুকের ভেতরে আগুন জ্বলছে যেন।

মাথা ঘুরে গঙ্গাধর বিলের নরম কাদার মধ্যে পড়ে গেল—পড়ে গেল তার রাঙী গোরুটার পাশেই। কাপড়ের খুঁট থেকে ঝর ঝর করে ছড়িয়ে পড়ল ধান। অনেক গাঁজার নেশা করে তার হৃৎপিণ্ড দুটোকে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে গঙ্গাধর। নিজেও জানত না—অনাহার আর পরিশ্রম মিলে বাকী কাজটুকুও শেষ করে দিয়েছে। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে বিলের কালো কাদার ওপরে জমতে লাগল।——

—তারপর একদিন গাঁয়ের লোক দেখলে গঙ্গাধর

যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেখানে নরম কাদার ভিতর থেকে ধানের এক গুচ্ছ শীষ উঠছে। সতেজ—সবুজ এক গুচ্ছ ধান। বিষাক্ত কাদার বুকে নতুন জীবনের সোনালি সম্ভাবনা। বেঁচে থেকে গঙ্গাধর যা স্বীকার করতে পারেনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাই সে প্রমাণ করে গেল।

তারও পরে একদিন শেষরাত্রে বারো সরিকের বিলের উপর তরল অন্ধকার যেন চকিত হয়ে উঠল। দুর্গন্ধ মরা জল আর বিষাক্ত কাদার মধ্যে অসংখ্য কোদালের ঘা পড়ছে। ঝপ ঝপ ঝপাঝপ। বায়াত্তর সরিকের ঘর থেকে বারো শো গোয়ালা এসেছে বিলে বাঁধ দিতে।

অহমিকা আর দুর্বুদ্ধির যে মুষল একদিন যদুবংশকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, সেই মুষলটাকে চিনে ফেলেছে ওরা। দ্বারাবতীর একক রাজত্ব বহু মানুষের সাম্রাজ্যে রূপায়িত হবে বারো সরিকের বিলে। দিগদেশ জয় করা লুঠের সোনা নয়—পৃথিবীর বুক থেকে সোনা, মাটির তলা থেকে সোনা।

—তাড়াতাড়ি কোদাল চালিয়ে যাও ভাই. দুদিনের মধ্যে শেষ করে ফেলতে হবে। এর পরে বানের জল এলে আর সময় থাকবে না।

বানের জল এলে সত্যিই আর সময় থাকবে না। ঝপ ঝপ ঝপাস। বারো শো কোদালের ঘা পড়ছে। অন্ধকারের মধ্যে বারো শো ছায়া মূর্তিকে মনে হচ্ছে সেই তারা—যাদের পেশীতে

একদিন শক্তির তরঙ্গ তুলে যেত সমুদ্রের মতো, পৃথিবীর মাটিতে যারা একদিন বেঁচেছিল বলিষ্ঠ প্রাণের বহু ব্যক্তির সগৌরব অধিকারে।

সেদিন আবার ফিরে আসবে। কালো রাত্রি শেষ হয়ে গিয়ে সূর্য উঠবে—প্রথম সোনালি আলোর স্পর্শপাতে বারো সরিকের বিলে সোনার ধান আনন্দিত উল্লাসে মর্মরিত হবে।

বীরভোগ্যা

এক হাজার একর প্ল্যাণ্টেশন। নেহাৎ ছোট নয় বাগানটা। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিরীষের ছায়ায় ছায়ায় সমান মাপে ছাঁটাই করা গাছগুলো যেন সবুজের নিস্তরঙ্গ সমুদ্র।

সুপারভাইজার মধুবাবু শোলা হ্যাটটা মাথায় চাপালো। ছ ফুট দীর্ঘ চেহারার মানুষটা। কালো কঠিন দেহ রোদে জলে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। ঘাড় আর গলার মাঝামাঝি জায়গায় তিনটে সমান্তরাল উজ্জ্বল চিহ্ন। ডুয়ার্সের রামসই ফরেষ্টে বাঘে আঁচড়ে দিয়েছিল। বাঁ হাতের বিশাল কালো মণিবন্ধে ট্যাক ঘড়ির আকারের প্রকাণ্ড একটা রিস্টওয়াচ শোভা পাচ্ছে।

কুটিল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মধুবাবু চারদিকে তাকালো একবার। সতেরো নম্বর প্লটে প্লাকিং চলছে। ওঁরাও আর সাঁওতাল মেয়েদের হাতগুলো যেন খেলা করে যাচ্ছে গাছের মাথায় মাথায়। পিঠের ঝুড়িগুলোতে সরস চায়ের পাতা স্তূপাকারে জমে উঠছে।

আকাশে খরখরে রোদ। সূর্য যেন আগুন বৃষ্টি করছে। পিঠের সঙ্গে এক একটা করে তালি মারা ছেঁড়া ছাতা বেঁধে নিয়েছে কুলি মেয়েদের কেউ কেউ। নিজেদের জন্যে নয়

ঝুড়ির পাশে কাপড়ের পুঁটলিতে বাঁধা আছে ওদের দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান—এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাদেরই জন্যে।

বাঁ দিকের লাইনে একটি মেয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। একটা শিরীষ গাছের আড়ালে পড়েছে সে, ভালো দেখা যাচ্ছে না। শুধু গাছের পাতায় পাতায় একটি সুগঠিত বাহু এবং সুকুমার আঙুলের আন্দোলন চোখে পড়ছে। একটুখানি ইতস্তত করে তারই দিকে পা বাড়ালো মধুবাবু।

কুলি মেয়েদের চোখে চোখে বিদ্যুৎ শিখার ইঙ্গিত বয়ে গেল। জল-তরঙ্গের মতো খানিকটা মিষ্টি হাসি তিন চারটি কণ্ঠ থেকে উচ্ছলিত হয়ে গেল দিকে দিকে। ওরা বুঝতে পেরেছে অনেক দিন আগেই। মধুবাবুরও গা-সওয়া হয়ে গেছে এসব। আজ একদিন দুদিন নয়—বাঙলা আর আসামের চা-বাগানে পঁচিশ বছর কাজ করছে সে।

হাতের লাঠিটা ঠুকঠুক করে মধুবাবু এগিয়ে গেল নেপথ্যচারিণী মেয়েটির দিকে। যে গাছ থেকে সে পাতা তুলছিল ঠিক এসে দাঁড়ালো তারই সামনে। অন্য কেউ হলে মুহূর্তে চকিত আর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। কোথায় একটু ভুল হয়ে যায়, কোথায় প্লাকিং এক ইঞ্চি নেমে পড়ে। তা হলে আর কথা নেই, পুরুষ নারী নির্বিচারে মধুবাবুর লাঠিটা তারই পিঠে গিয়ে পড়বে। কিন্তু এমেয়েটি ভ্রূক্ষেপ করলে না একবিন্দুও—নির্বিকার মুখেই কাজ করে চলল। রোদ ভয়ানক চড়ে গেছে,

বারোটার বাঁশি বাজতে আর দেরী নেই। দৈনিক রোজগারের পয়সাটা এর মধ্যেই যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে নিতে হবে।

শিরীষ গাছের আড়ালে অন্য মেয়েদের দেখা যাচ্ছে না। মধুবাবু একবার কাশ্‌ল।

—টুনি, টুনি।

টুনি ঝাঁজিয়ে উঠল এবারে: কাজের সময় বিরক্ত করছ কেন?

—বাঃ, কাজ দেখব না?

—কাজ দেখবে তো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো না। ডাকাডাকি করছ কেন খালি খালি?

—ত্তুত্তোর—খপ করে মধুবাবু টুনির একখানা হাত টেনে নিলে নিজে হাতের মধ্যে: রেখে দে তোর কাজ। চার ছ আনা পয়সা পুষিয়ে দেব আমি।

বিদ্যুৎবেগে হাত ছিনিয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালো টুনি।

—তোমার লাজ-ডর কিছু নেই বাবু? এই দিনের বেলায়?

মধুবাবু হেসে উঠল। ছ ফুট লম্বা বলিষ্ঠ মানুষের কালো কালো মুখে খানিকটা অমানুষিক লোলুপতা উঠল রেখায়িত হয়ে।

—কী করব বল? তুই যে রকম পালিয়ে বেড়াচ্ছিস, তাতে দিন-রাত্তির বলে কিছু আছে নাকি আমার?

—ইস্—ইস!

একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষে মধুবাবুকে জর্জরিত করে দিয়ে আরো কয়েক পা সরে দাঁড়ালো টুনি। সুকুমার আঙুলের স্পর্শে চায়ের পাতাগুলো দক্ষিণা বাতাসে ঝরে যাওয়া ফুলের পাঁপড়ির মতো হাতের মধ্যে এসে পড়তে লাগল।

মধুবাবুর স্নায়ুর ওপরে ক্রিয়া করছে দুপুরের প্রখর রোদ। হাজার একর বাগানের শ্যামল সমুদ্রের ফ্যাক্টরীর কালো চিম্‌নিটা ধোঁয়ার নিশ্বাস ছাড়ছে, যেন স্তব্ধ হয়ে আছে একটা অতিকায় জাহাজ। শিরীষের পাতায় বাতাস ঝির ঝির করছে। বাগানের ওপারে সমুন্নত গৌরবে মাথা তুলেছে দুর্গম আর দূরান্তব্যাপী শালের বন—সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে ময়ূরের ডাক। আর একদিকে ফ্যাক্টরী থেকে উঠছে যন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন কলরব। যুদ্ধের তাগিদে মেশিনের আর বিশ্রাম নেই—প্লাইউডের বাক্সে বন্দী হয়ে হাজার হাজার পাউণ্ড গ্রীণ টী, ব্ল্যাক টী চলে যাচ্ছে ফ্রণ্টে রণক্লান্ত সৈনিকদের সজীব করবার জন্যে, শত্রু নিধনের প্রেরণা দেবার জন্যে।

মধুবাবুর শরীরের রক্ত কোলাহল করে উঠল। ছোট ছোট চোখ দুটোয় যেন ঝলক দিলে আগুন। শিরীস গাছটা চমৎকার আড়াল দিয়েছে। কিন্তু কিছু একটা করবার আগেই যেন কার একটা প্রচণ্ড আঘাত লেগে তার আচ্ছন্ন চেতনাটা সজীব হয়ে উঠল।

মধুবাবুর চোখে কতখানি জ্বলেছিল আগুন? তার চাইতে

সহস্র গুণে বেশি আগুন আর দুটো চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে। সত্য যুগ হলে তার তাপে এতক্ষণে এক গাদা ভস্মস্তূপে পরিণত হয়ে যেত মধুবাবু। যেন আকাশের সূর্যকে অতসী কাচের মতো নিজের চোখের মধ্যে প্রতিফলিত করে তারই দীপ্তিটা সে মধুবাবুর দিকে বিচ্ছুরিত করে দিয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো মধুবাবু। লোকটা তো ছিল অনেক পেছনে, কখন লাইন ধরে এতটা এগিয়ে এসেছে ? তাকে লক্ষ্য করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে এর ?

প্রকাণ্ড মণিবন্ধের নিচে প্রকাণ্ড মুঠিতে লাঠিটা শক্ত হয়ে উঠল। ঘাড়ের নীচে জ্বলজ্বল করতে লাগল বাঘের আঁচড়ের দাগটা। সম্বলের মধ্যে তো ধামার মতো একটা পিলে। গায়ে জোর নেই বলে কোনো শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারে না, মেয়েদের দলে মিশে পাতা তুলতে আসে বাগানে। আর সেই রাজুয়ার দৃষ্টিতেই কিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান !

মুখের মধ্যে দাঁতগুলো কড় কড় করে উঠল মধুবাবুর। যেন রাজুয়াকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। পায়ের ভারী জুতোটা মসমস করে এগিয়ে গেল সে। রাজুয়ার চোখ তখন নেমে গেছে, কিন্তু উত্তেজনায় তার হাত দুটো যে থর থর করে কাঁপছে সেটা মধুবাবুর দৃষ্টি এড়ালো না।

অগ্নিগর্ভ চোখ মেলে মধুবাবু রাজুয়ার কাজ লক্ষ্য করতে লাগল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই প্রকাণ্ড হাতে

একটা দশসেরী চড় এসে পড়ল রাজুয়ার গালে। চড়ের শব্দে সমস্ত প্লটটা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

—হতভাগা রাস্কেল! কী করেছিস তুই?

চড় খেয়ে রাজুয়া একটা গাছের ওপর উল্টে পড়েছিল। টলতে টলতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—কেন মারলি বাবু?

—মারব না? হতভাগা, শূয়ার! ক ইঞ্চি নামিয়ে ফেলেছিস খেয়াল আছে? তাকিয়ে ভাখ দেখি একবার।

অপরাধ হয়ে গেছে সত্যিই। মানসিক উত্তেজনায় কখন যে প্লাকিং নামিয়ে ফেলেছে রাজুয়ার খেয়াল হয়নি। কিন্তু এমন মারাত্মক কিছু নয়, এ ভুল হামেশাই হয়। মানুষ কল নয়, হাত ঠিক থাকতে পারে না সব সময়ে। কিন্তু শাস্তি যেখানে দিতেই হবে অপরাধ সেখানে যত গৌণই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

—ভুলহয়ে গেছে বাবু।

—ভুল হয়ে গেছে! বিশ্রী রকমভাবে বড় বড় দাঁতগুলোকে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে দিয়ে মধুবাবু খিঁচিয়ে উঠল: লজ্জা করে না? পুরুষ হয়ে মেয়েদের সঙ্গে পাতি তুলতে এসেছিস, তবু হাত ঠিক থাকে না? ব্যাটা গোভূত, জানোয়ার কোথাকার!

সমস্ত প্লট জুড়ে মেয়েদের হাসি উত্তাল হয়ে উঠেছে। জল-

তরঙ্গের বাজনা নয়, দুপুরের জ্বলন্ত রৌদ্রে যেন বিষ মাখানো তীরের মতো তাদের হাসি এসে বিঁধছে রাজুয়ার গায়ে। গালে প্রচণ্ড চড়টা বিছুটির আঘাতের মতো জ্বালা করছে। চোখের কোণে জল এসেছিল, কিন্তু মনের উত্তাপে সে জল শুকিয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল।

মেয়েরা হাসছে—উচ্ছলিত হাসির আবেগে তাদের কালো সুঠাম শরীরে যেন রূপের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। রাজুয়ার পায়ের নীচে মাটি কাঁপতে লাগল। খুন করবে মধুবাবুকে, খুন করে ফেলবে সে—যদি সন্ধ্যার অন্ধকারে কোনোদিন কুলি লাইনের কাছে পায়, তা হলে দায়ের এক কোপে সোজা মাথাটা নামিয়ে দেবে মাটিতে।

—ভোঁ-ও-ও

ফ্যাক্টরীর বাঁশি বাজল—বারোটার বাঁশি। মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল পাতি তোলা। সকালের কাজ এইখানেই শেষ। এইবারে ফ্যাক্টরীতে গিয়ে পাতা জমা দিতে হবে—কাজের ওজন মতো পয়সা মিলবে।

—ভোঁ-ও-ও

বাঁশি ডাকছে অধৈর্যভাবে। লাইন ভেঙে সমস্ত দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ফ্যাক্টরীর দিকে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল মধুবাবু, হারিয়ে গেল টুনি, হারিয়ে গেল রাজুয়া।

ফ্যাক্টরীর কিন্তু বিশ্রাম নেই।

সকাল আটটা থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত যন্ত্রগুলো অব্যাহত নিয়মে গর্জন করে চলে। জালের ওপরে মেলে দিয়ে পাতাগুলো উইদারিং করা হয়—যন্ত্রের নির্মম পেষণে সবুজ রসটা নিষ্কাশিত করে এনে ফেলা হয় ড্রায়িং মেশিনে। লেভার হাতলে টান পড়ে, ঘুরন্ত চালনীর ওপরে সাতপাক ঘুরে তলায় এসে জমা হয় চা। তারপর সর্টিং—ব্লেণ্ডিং—অরেঞ্জ পিকো, পিকো ফ্যানিংস—কত বিচিত্র নাম! ওদিকে কুলি লাইনের জীর্ণ খড়ো চালাগুলোর ওপর ঘনায় বিষণ্ণ অন্ধকার—সারাদিন নাইট্রোজেন টেনে সন্ধ্যায় লক্ষ লক্ষ চা গাছ কার্বনের বিষ নিশ্বাস ছাড়ে। ম্যালেরিয়া—কালা-জ্বর—অস্বাস্থ্য। মেশিনের উত্তাপে লোহার কোলাহলে রোস্টিংয়ের কটু বাষ্প আর ক্রুড অয়েলের দুর্গন্ধের মধ্যে কুলিরা কাজ করে। আর সুদূর শহরে ঠিক সেই সময়ে সোণালি চায়ের পাত্র সামনে সাজিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার আসর জমে ওঠে—রেডিয়োতে উদাস করা ক্লারিয়োনেট বাজতে থাকে। চায়ের টেবিলে স্বপ্ন নামে, মনে পড়ে যায় কোথায় পিয়ালী নদীর ধারে তমালকুঞ্জ—সেখানে সাঁওতাল পুরুষের মাদলের তালে সাঁওতাল মেয়ে নাচছে লীলায়িত ছন্দে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেউ কেউ ভাবে এর চাইতে সাঁওতাল হতে পারলেই ছিল ভালো।

কিন্তু চা বাগানের সাঁওতালেরা তা ভাবে না। পিয়ালী নদীর ধারে পেটের ভাতের সংস্থান হয় না, তাই চা-বাগানে

কাজ করতে এসেছে। কোথায় গেছে মাদল—ভেঙে চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ফ্যাক্টরীর কাঁকর-মেশানো ধুলোতে। মহুয়ার মদ নেই—দেশী মদের দাম উঠেছে পাঁচগুণ। নাচবার মতো পায়ে আর জোর নেই, এনেফিলিস বহু আগেই চুষে নিংড়ে শেষ করে দিয়েছে সব।

ফ্যাক্টরীর পেছন দিককার কাঠের সিঁড়িটা অন্ধকার। রাজুয়া নীরবে তারই ওপরে এসে বসল। বাঁ দিকে বাবুদের কোয়ার্টার-গুলো বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে। আর সেই মাঠ পেরিয়ে যতদূর চোখ যায় শিরীষের ছায়ায় ছায়ায় এক হাজার একরের বাগান বিস্তীর্ণ হয়ে আছে তরল তমিস্রার নীচে। তারও ওপারে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে নভোস্পর্শী শালের বন—একেবারে টেরাই পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

—কোন্ বৈঠা হুয়া হিঁয়াপর ?

গম্ভীর কঠিন গলা, পাঞ্জাবী কুলি সর্দারের প্রকাণ্ড মুখ আর চাপ দাড়ি যেন অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

—রাজুয়া।

—রাজুয়া ? হাঃ হাঃ হাঃ—অয়েল ইঞ্জিনের মতো শব্দ করে গম্ভীর চড়া গলায় পাঞ্জাবী কুলি সর্দার হেসে উঠল: বহুৎ আচ্ছা—হাওয়া খাও। পাত্তি তোড়নে মে বহুৎ ভারী মেহনৎ—আঁ—হাঁ ?

নাগড়া জুতোর মসমস শব্দ ফ্যাক্টরীর দিকে অগ্রসর হয়ে গেল।

কালো অন্ধকারে কালো শরীরটাকে মিলিয়ে দিয়ে বসে রইল রাজুয়া। সবাই তাকে অপমান করে—অবজ্ঞা করে তাকে। দুর্বল শরীর, অপটু স্বাস্থ্য—প্রত্যেকের কাছে একান্ত ভাবে পরিহাসের বিষয়। তাকে এরা কৃপার চোখে দেখে, মেয়েদের চাইতে অপটু জীব বলে কল্পনা করে।

কিন্তু কেন এমন হল? কে এমন করে দিলে তাকে? দুমকা থেকে যখন এসেছিল, তখনও তো পাথরের মতো ছিল স্বাস্থ্য। তার শরীর দেখে হিংসে করত পুরুষেরা, উজ্জ্বল প্রসন্ন চোখে তাকাতো মেয়ের দল। তার হাতের ছোঁয়ায় যৌবনের আনন্দে মাদল যেন কথা কয়ে উঠত। রোস্টিং মেশিনে কাজ করেছে, ড্রায়িংএ কাজ করেছে, ডায়নামোতে বেল্ট পরিয়েছে, সারা দুপুর হিউয়িং করেছে। সে সব দিন কোথায় গেল?

এই চায়ের বাগান শুষে খেলে তাকে। এখানকার বাতাস যেন চুমুক দিয়ে টেনে নিল তার শরীরের সমস্ত রক্ত। যেমন করে তাদের সাঁওতাল পরগণায় অভিচার-সিদ্ধ গুণিনেরা পিশাচ চালান দিয়ে টাটকা মানুষের হৃৎপিণ্ড খাইয়ে দেয়, ঠিক তেমনি করে। রাজুয়ার মনে হল এই হাজার বিঘার বাগানটাও পিশাচে পাওয়া, কারো নিস্তার নেই, কেউ রক্ষা পাবে না।

টানা দু বছর ধরে কালা-জ্বরে ভুগবার পরে আজ আর হাড়-চামড়া ছাড়া কোনো অবলম্বন নেই। সমস্ত জীবনটাই যেন ওর কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। মধুবাবু ওকে চড় মেরেছে। যদি শরীরে শক্তি থাকত, তা হলে কি মুখ বুজে সয়ে যেত এই অপমানের জ্বালা? এক ঘুষিতে মধুবাবুর উঁচু উঁচু দাঁতগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে মিলিটারীদের সঙ্গে কাজ করতে চলে যেত আসামে।

কিন্তু এই শরীর। তাকে অপটু অসহায় করে ফেলেছে—বেঁধে ফেলেছে মৃত্যুর শিকলে। এখান থেকে নড়বার পথ নেই তার। আর টুনি। দু বছর আগে ওর সঙ্গে টুনির বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওর স্বাস্থ্যের জন্য টুনির বাপ শেষ পর্যন্ত বিয়ে ভেঙে দিলে।

দুর্বল শরীরে তবু রক্ত চন চন করে উঠল। ওই মধুবাবুকে! ওই মধুবাবুকে খুন সে করে ফেলবে—যেদিন হোক—যেমন করে হোক!

কাঠের সিঁড়িতে লঘু পায়ের শব্দ।

—কে?

—টুনি।

হাল্কা পা ফেলে টুনি উঠে এল ওপরে।

—এখানে বসে আছিস রাজুয়া?

—আছিই তো। তোর কী তাতে!

—চটছিস কেন ? অন্ধকারের মধ্যে টুনির মিষ্টি হাসির শব্দ শোনা গেল ঃ আমার ওপরে রাগ করেছিস ? আমি তো তোকে মারিনি।

মারেনি। কিন্তু মারলে এর চাইতে বেশি আর কী করতে পারত। গায়ের মধ্যে রক্ত ফুটছে—রাজুয়া চুপ করে রইল। অন্ধকার নির্জন সিঁড়ি। ইচ্ছে করলেই টুনিকে বুকের ভেতর টেনে নিতে পারে, পিষে ফেলতে পারে একেবারে। কিন্তু শক্তি নেই শরীরে, শক্তি নেই মনে। চোখের সামনে মধুবাবুর অশরীরী মূর্তিটা যেন একটা নির্মম দুঃস্বপ্নের মতো দাঁড়িয়ে। রোদে জলে পোড়া ছ ফুট দীর্ঘ চেহারা—মুখের হাসিতে লোলুপ নিষ্ঠুরতা। ঘাড়ের নীচে শোভা পাচ্ছে বাঘের আঁচড়ের জয় টীকা। কথায় কথায় হাত চলে, লাঠি চলে। ম্যানেজারের আপনার লোক সে—বাগানে তার দোর্দণ্ড প্রতাপ।

—মধুবাবু তোকে মারলে ভারী দুঃখ লাগল আমার। একটু সাবধান হয়ে কাজ করলেই তো পারিস।

রাজুয়া তবু জবাব দিল না।

টুনির কণ্ঠ স্নেহস্নিগ্ধ ঃ কেন এত কাহিল তুই ? কেন তুই পুরুষের মতো তেজীয়ান হয়ে উঠতে পারিস না ? কেন বোকার মতো পড়ে পড়ে মার খাস ?

তিক্ত তীব্র গলায় রাজুয়া বললে, তুই এখান থেকে যা টুনি।

আচমকা টুনি হেসে উঠল। কোথা থেকে কী হল কে

জানে, তার কণ্ঠস্বরে সেই স্নেহ আর সহানুভূতির আবেশ যেন মুহূর্তে কুয়াশার মতো মিলিয়ে গিয়েছে।

—আমি যাব এখান থেকে ? কেন ? তুইই তো যাবি। সত্যি আর বসে থাকিসনে রাজুয়া, তোর দুবলা শরীর, ঠাণ্ডা লাগবে।

—আমার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।

—আমি ভাবব কেন ?—নিষ্ঠুর ভাবে হাসতে লাগল টুনি : মধুবাবু ভাবছে। এক্ষুনি এখানে আসবার কথা আছে তার। এই বেলা পালা রাজুয়া।

বিদ্যুৎবেগে রাজুয়া উঠে দাঁড়াল। দু'হাত দিয়ে যদি এই অন্ধকারে প্রাণপণে গলাটা টিপে ধরে, তাহলে কতক্ষণ হাসতে পারে টুনি ? কিন্তু কিছুই করল না রাজুয়া—শুধু ক্ষিপ্রবেগে নেমে গেল নীচে।

সিঁড়িতে হাসির শব্দ—টুনি হাসছে। কালো অন্ধকারের মধ্যে সে হাসিটা যেন পেছনে পেছনে তাড়া করে আসছে।

দু'দিন ধরে বাগানে পাতি তুলতে এল না রাজুয়া। কিন্তু দু'হাজার কুলির মধ্যে ওর কথা ভাববার মতো সময় নেই কারো। অবিশ্রান্ত গর্জন চলেছে যন্ত্রের। হাজার হজার পাউণ্ড চা—ব্ল্যাক টী, গ্রীণ টী। যুদ্ধের দাবী—সভ্যতার দাবী। শহরের ড্রয়িং রুমে সোনালী চায়ের পাত্র সামনে নিয়ে সোনালী স্বপ্নের বাসর।

দু'দিন বসে বসে রাজুয়া শান দিলে সড়কিতে। ঝকঝকে করে তুলল সাঁওতালী তীরের ফলাগুলো। একটু গোখরো সাপের বিষ পেলে মাখিয়ে নিত ওর কাঁড়ের মাথায়। তার পরে অব্যর্থ লক্ষ্য। রক্তের মধ্যে একবার সে বিষ মিশলে আর দেখতে হবে না।

সেদিন ভোরে কুলি লাইনে গুরগুর করে সাড়া পড়ল মাদলের। রাজুয়ার যেন চমক ভেঙে গেল। দূরে কারখানার প্রথম বাঁশি বেজে উঠেছে। কিন্তু সে বাঁশির শব্দ ছাপিয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে এই মাদলের গুরুগর্জন। ম্যালেরিয়া-মন্থর রক্তের লক্ষ লক্ষ কণিকায় জোয়ারের ডাক।

মাদলে এ কিসের সঙ্কেত? বসন্ত রাত্রে মহুয়ার নেশায় বিহ্বল হয়ে যে মাদল বাজে এ তো সে নয়। এই মাদলের শব্দে মনে পড়ে যায় তার দেশের কথা—ভুলে যাওয়া একটা বলিষ্ঠ জীবন—একটা অমিত শক্তিমান জীবনের কথা। পাহাড়ের মাথায় নেমেছে কালো মেঘে ঘন-বর্ষণ। পাথর গুঁড়িয়ে নামছে ঝোরার জল,—নদীতে বান ডেকেছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে শালের ফুল—হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে শালের পাতা। শিকারের ডাক। বাঘ, ভালুক, বরা বর্ষার জলে দিশেহারা হয়ে গেছে—কাঁড়ের ফলায় তাদের গেঁথে ফেলবার এই সুবর্ণ সুযোগ।

রাজুয়া বেরিয়ে এল বাইরে। মাদলে সাড়া দিয়েছে রণ-

দামামা—কুলি লাইনের সব জোয়ান বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সার বেঁধে। তাদের পিঠে ধনুক, হাতে বল্লম। যেন যুদ্ধযাত্রা করছে সব।

—কিরে, কোথায় যাচ্ছিস সব ?

—আজ বিশুয়া।

বিশুয়া! তাই বটে। পয়লা বৈশাখ। বছরের এই প্রথম দিনটিতে আদিম পৃথিবীর সন্তানেরা বার হয় শিকার করতে—আজ তাদের শিকারের পর্ব দিন। তাদের হিংস্র আরণ্য জীবনের নব-বার্ষিকী বোধন উৎসব। ফ্যাক্টরীর জোয়ানেরা সবাই ছুটি পাবে আজকে—রাজার জঙ্গলে শিকারে আজ আর বিধিনিষেধ নেই।

—আমি যাবো বিশুয়া খেলতে।

—তুই!

মাদলের শব্দ ছাপিয়ে মুখর হয়ে উঠল অট্টহাসি—তরল তীক্ষ্ণ হাস্যির কলরোল। মোটা তারের চাইতে সরু তারের ঝঙ্কারটাই কাণের মধ্যে তীব্রতর ভাবে আঘাত করে। ওপাশে সব চাইতে বেশি করে হাসছে টুনিই না ? কিন্তু এবার আর রাজুয়ার মাথা সঙ্কোচে নুইয়ে গেল না মাটিতে। চোখের অতসী কাঁচ থেকে প্রতিফলিত হয়ে পড়ল সূর্যের আলো। মধুবাবুর পালা পরে আসবে, তার আগে—

—আমি যাচ্ছি জঙ্গলে।

এক লাফে ঘরে ঢুকল রাজুয়া—বের করে নিয়ে এল শান দেওয়া সড়কী, চকচকে কাঁড়।

জোয়ানেরা আবার প্রচণ্ড ভাবে হেসে উঠল—টুনি হাসিতে টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে পড়ছে। রাজুয়া আর দাঁড়ালো না—একাই সে শিকারে যাবে, একা হাতেই জানোয়ার মেরে আনবে সে। নক্ষত্রবেগে রাজুয়া এগিয়ে গেল বনের দিকে।

বাগানের সীমানা পেরিয়েই শালের বন। ষোল-সতেরো মাইল ধরে টানা এই জঙ্গল, তিস্তার পাশ দিয়ে একেবারে টেরাইয়ের অরণ্যে গিয়ে মিশেছে। একহাতে সড়কী বাগিয়ে ধরে রাজুয়া ঢুকল জঙ্গলের মধ্যে।

লতা-গুল্মে জটিল হয়ে শালের বন চলেছে। মাথার ওপরে আকাশ দেখা যায় না। পায়ের তলায় শুকনো শালের পাতা মড় মড় করছে। কয়েকদিন আগে দাবানল জেগেছিল অরণ্যে—শালের শুকনো চারাগুলো পোড়া তামাটে রঙ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওখানে হরিয়াল ডাকছে—ঘুঘু ডাকছে—সামনে দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে বন-মুরগী। থেকে থেকে কাঁটা গাছের চাবুক শপাৎ করে মুখের ওপর এসে পড়ছে।

ওটা ওখান দিয়ে কী দৌড়ে গেল? নিশ্চয় সম্বর। ওর একটাকে বসাতে পারলেই কাজ হয়ে যায়। এখান ওখান থেকে উর্ধশ্বাসে পালাচ্ছে বন-মুরগী। একটা মোরগ, একটা মুরগী আর দু-তিনটে বাচ্চার একটা সম্পূর্ণ সংসার। ইচ্ছা

করলেই ওদের কতগুলো সংগ্রহ করা চলে। কিন্তু ছোট শিকারের ওপর রাজুয়ার লোভ নেই, আজ বড় শিকার সে মারবে—বাঘ, ভালুক, সম্বর, নীল গাই—হাতের কাছে যা আসে।

সামনেই প্রায় দশ হাত নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝোরার ক্ষীণ ধারা। এখানে ওখানে পচা-কাঠের টুকরো জলের মধ্যে পড়ে আছে—ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি নুড়ি। ঝোরার দুপাশে ছোট ছোট গাছ আর ঝোপ-ঝাপে মিশে দুর্ভেদ্য আরণ্যময়তা। ওই সব জঙ্গলের মধ্যেই জানোয়ারের আস্তানা। ঝোরার থেকে জল খায়, দুপুরের খর-রৌদ্রের সময় সূর্যহীন জঙ্গলের নীল ছায়ায়—ঠাণ্ডা নরম কালো মাটিতে বসে জিভ মেলে হাঁপায়।

জঙ্গল ভেঙে চলেছে রাজুয়া। বেতের কাঁটায় গা-হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে। পায়ের নীচে বাজছে ধারালো নুড়ি। হাঁটু পর্যন্ত বসে যাচ্ছে জলে আর কালো কাদায়। কিন্তু কোথায় শিকার ?

ঝর—ঝর—ঝর—

ওদিকে জঙ্গল নড়ে উঠল। কী একটা জানোয়ার দ্রুত-গতিতে সরে যাচ্ছে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দও যেন কানে এল। নিশ্চয় বরা।

রাজুয়ার সমস্ত পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল। জ্বরতপ্ত

জ্বলন্ত শরীরে নতুন রক্ত সাড়া দিলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিশানা ঠিক করে নিয়ে প্রাণপণে বল্লম ছুঁড়ে দিলে রাজুয়া। সাঁওতাল পরগণার পাহাড় থেকে শেখা—শব্দভেদী লক্ষ্য।

আর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ-ফাটানো গর্জন। যেন জঙ্গলের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে গেল একটা। শাল গাছগুলো আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল—চারদিকে ছিটকে উড়ে গেল বন-মূরগী। আর জঙ্গল ভেদ করে হাওয়ার মুখে প্রায় আট হাত উঁচু দিয়ে একটা বিরাট সোনালি আগুন রাজুয়ার গায়ের ওপর এসে উড়ে পড়ল—পরক্ষণেই অরণ্য আলোড়িত করে মিলিয়ে গেল আবার। বরা নয়, গুল-বাঘ নয়—প্রকাণ্ড ডোরাদার। ঝোবার পাশে কাদা আর নুড়ির ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাজুয়া।

আলু খলিফার শেষ খুন

আগে নাম ছিল আলাউদ্দিন—সংক্ষেপে দাঁড়ালো আলু। আলু নয়—আলু খলিফা।

লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমান—জাত কশাইয়ের ছেলে। লাল টক্‌টকে দুটো চোখ যেন হিংসায় আরক্তিম হয়ে আছে। হাতে লম্বা একখানা চক্‌চকে ভোজালি—তার হাতীর দাঁতের বাঁটটার রঙ প্রথমে ছিল দুধের মত শাদা। কিন্তু অনেক পশুর রক্ত জমতে জমতে তার রঙ হয়েছে কুচ্‌কুচে কালো। শুধু ভোজালির ফলাটায় এতটুকু মালিন্য পড়েনি—ক্রমাগত রক্ত-মাংসের শাণ পড়ে পড়ে এখন যেন তার ওপর থেকে হীরের আলো ঝলকে যায়।

আকস্মিক এক দিন দর্শন দিলে প্রেতমূর্তির মতো।

শীতের সকাল, কিন্তু সকাল হয়নি। শেষ রাত থেকে নেমেছে স্তরে স্তরে কুয়াসা। দূরের নিদ্রিত নির্বাক্ সিংহাবাদের বিস্তীর্ণ হিজলের বন থেকে, কৃষ্ণকালীর বিলের দুর্গন্ধ মরা জলের ওপর থেকে সেই কুয়াসা উঠে এসেছে—সমস্ত বন্দরটা শীতের আড়ষ্টতায় পড়ে আছে মূর্ছাতুরের মতো। দু'হাত দূরের মানুষ চোখে দেখা যায় না।

মদ-গাঁজার সরকারী লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডার জগদীশ

তখন অঘোর ঘুমে মগ্ন। জগদীশ নেশা করে না, কিন্তু দিন-রাত নেশার জিনিষ নাড়াচাড়া করে তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে একজাতীয় অভ্যস্ততা এসে দেখা দিয়েছে। নিজের পরিচিত জায়গাটিতে না শুলে ঘুম আসে না জগদীশের। কেরোসিন-কাঠের পুরোনো তক্তাপোষ থেকে সারি সারি ছারপোকা সারা রাত সুড়সুড়ি দেয়—মাথার কাছে পায়া-ভাঙ্গা টেবিলে গাঁজার নিক্তি আর গাঁজার পুরিয়া থেকে নিরুদ্ধ ঘরের মধ্যে অত্যুগ্র দুর্গন্ধ ভেসে ভেসে বেড়ায়, পায়ের কাছে পঁয়তাল্লিশ গ্যালন মদের পিপা থেকে পচা মহুয়া, চিটেগুড় আর অ্যাল্‌কোহলের একটা সুরভি নিশ্বাসে নিশ্বাসে জগদীশের স্নায়ুগুলোকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। ওয়াড়হীন বাঁদিপোতার লেপে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে জগদীশ মধুর স্বপ্নে তলিয়ে থাকে। স্বপ্ন দেখে: বন্দরের খোকা ভুঁইমালির সুন্দরী বিধবা বোনটা তার জন্যে এক খিলি দোক্তা-দেওয়া পান এনে সোহাগভরা গলায় তাকে সাধাসাধি করছে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে জগদীশ লেপের মধ্যে যখন বিড়-বিড় করে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই কানের কাছে যেন বাজ ডেকে গেল।

খোকা ভুঁইমালির সুন্দরী বোনের কোকিল-কণ্ঠ নয়, এমন কি খোকার কট্‌কটে ব্যাঙের মতো গলাও নয়। জগদীশ লাফিয়ে উঠে বসল।

বন্ধ দরজায় তখন লাঠির ঘা পড়ছে। ঘরের মধ্যে শীতার্ত অন্ধকারে মিট্ মিট্ করছে লণ্ঠনের লাল-শিখা, রাত শেষ হয়েছে কি না জগদীশ অনুমান করতে পারল না। এমন অসময়ে যে-ভাবে হাঁকাহাঁকি করছে, ডাকাত পড়ল নাকি ?

শীতে আর ভয়ে জগদীশের দাঁত ঠক্ ঠক্ করে বেজে উঠল ঃ কে !

—দারু চাই বাবু।

দারু ! জগদীশের ধড়ে প্রাণ এল। নিশ্চয় মাতাল। অসীম বিরক্তিভরে দাঁত খিঁচিয়ে বিশ্রী একটা শব্দ করলে জগদীশ ঃ এই মাঝরাত্তিরে দারু ? ইয়ার্কি পেলি নাকি ? যা ব্যাটা—পালা।

আরো জোর গলায় কথাটার পুনরাবৃত্তি শোনা গেল ঃ দারু চাই বাবু।

ক্রুদ্ধ জগদীশ লেপটাকে গায়ে জড়িয়ে নিয়েই উঠে পড়ল, ধড়াস্ করে খুলে ফেললে দরজাটা। যাচ্ছেতাই একটা গাল দিয়ে বললে, সরকারী আইন জানিস ? বেলা নটার আগে—

কিন্তু কথাটা আর শেষ হতে পারল না। শীত-মন্থর আড়ষ্ট অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে পৈশাচিক ভাবে হেসে উঠল লোকটা, ঝিকিয়ে উঠল হাতের ভোজালিখানা। জগদীশ দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মতো, শুধু হাঁটুর অস্থি-সংস্থানগুলো যেন বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়ে পা দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগল।

—সরকারী আইন? আইন-ভাঙ্গা মানুষ আমরা বাবু, আইন দেখিয়ো না। দু পয়সা বেশি নেবে নাও, কিন্তু লক্ষ্মী ছেলের মতো এক বোতল কড়া মাল ব র করো দেখি। ভোর বেলায় হামলী আমার ভালো লাগে না।

দেখা গেল, ভোর বেলায় হামলী জগদীশও পছন্দ করে না। নিঃশব্দে আলমারী খুলে শিল-করা ত্রিশের একটা বোতল বার করলে। কর্ক স্ক্রুর প্যাঁচ পড়ল—হিস্‌স্‌ শব্দ করে তীব্র অ্যাল্‌কোহলের খানিকটা বিষ-বাস্প ছড়িয়ে গেল হাওয়ায়: কালো কোর্তা-পরা রাক্ষসের মতো চেহারার মানুষটা বোতলটাকে মুখের কাছে তুলে ধরল। ঢক-ঢক-ঢক। এক নিশ্বাসেই আগুনের মতো বিশ আউন্স পানীয় নিঃশেষিত। একবার মুখ বিকৃতি করলে না, শরীরের কোনখানে দেখা গেল না এতটুকু প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ। তারপর দুটো টাকা ছুঁড়ে দিলে টেবিলের ওপর, ভোজালিখানাকে হাতে তুলে নিলে, ব্যঙ্গচ্ছলেই কিনা কে জানে জগদীশকে একটা সেলাম দিলে এবং পায়ের নাগরা জুতোর মচমচ শব্দ করে বেরিয়ে গেল বাইরে। তমসাচ্ছন্ন কুয়াসায় মিলিয়ে গেল ভৌতিক একটা ছায়ামূর্তি।

আট গণ্ডা পয়সার চেঞ্জ পাওনা ছিল লোকটার—ফেলে গেছে অবজ্ঞাভরে। কিন্তু সেদিকে মন ছিল না জগদীশের। হাঁটুটা তখনো কাঁপছে, বুকের মধ্যে রেল্‌গাড়ীর ইঞ্জিনের মতো শব্দ হচ্ছে তখনো। স্তব্ধ স্তম্ভিত জগদীশ ভাবতে লাগল: কে

এই লোকটা যে এক নিশ্বাসে বিশ আউন্স আগুন পান করতে পারে এবং একটুখানি পা যার টলে না, যার হাসি অমন ভয়ানক এবং যার ভোজালি অমন ধারালো !

কিন্তু কয়েক দিন পরেই তার পরিচয় কারো কাছে অজানা রইল না।

লক্ষ্ণৌ সহরের এক্সটার্ণড গুণ্ডা। মোট পাঁচ বার জেল খেটেছে, দু বার রাহাজানিতে, তিন বার দাঙ্গায়। অবশ্য বয়সে ভাঁটা পড়েছে এখন, দাঙ্গা-রাহাজানি আলুর আর ভালো লাগে না। ছোট একটা মাংসের দোকান বসিয়ে নির্বিঘ্নে কয়েকটা শান্তিপূর্ণ দিন যাপন করবার বাসনাই তার ছিল। কিন্তু পুলিশের বুদ্ধি একটু ভোঁতা—সব জিনিষই বোঝে কিছু দেরিতে। অতএব সারা জীবন উন্মত্ততার মধ্যে কাটিয়ে যখন প্রৌঢ়ত্বে নখদন্তগুলোকে সে আচ্ছাদিত করবার চেষ্টায় আছে, সেই সময়েই তার ওপরে এক্সটার্নমেণ্টের অর্ডার এল।

প্রথমে ভেবেছিল মানবে না আইনের শাসন, লুকিয়ে থাকবে এদিকে ওদিকে। কিন্তু বৈচিত্র্যের লোভ, পৃথিবীকে ভালো করে ঘুরে দেখবার একটা মোহ তার মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে। এই লক্ষ্ণৌ শহর, নবাবি আমলের বাগ-বাগিচা, চক-বাজার—এর বাইরে কোন্ পরিধি—কত বড় বিস্তীর্ণ জগৎ ? লক্ষ্ণৌয়ের লু-হাওয়া ঘুর্ণির ঝড় উড়িয়ে ডাক পাঠালো আলু খলিফাকে। ট্রেণ ছুটে এল কলকাতায়।

ক্যানিং স্ট্রিটের এক খোলার ঘরে গ্রেট মোগলাই হোটেল। সেই হোটেলের ম্যানেজার এক দিন খুন হয়ে গেল। ফুসফুসের মধ্যে ভোজালির ধারালো ফলা বিঁধে গেছে আমূল। আলু খলিফার কিছু হাত ছিল কিনা অথবা কতখানি হাত ছিল ভগবান বলতে পারেন। কিন্তু পুলিশ আবার পেছনে লাগল—আলুকে কলকাতা ছাড়তে হল।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পড়েছে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে। উত্তর-বাংলার এক প্রান্তে মাঝারি গোছের একটা গঞ্জ। ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে সরীসৃপ-গতিতে। বাবলা গাছের ডালে বসে আছে শঙ্খচিল। এপারে ছোট গঞ্জ, বাঙালী আর হিন্দুস্থানী ধান ব্যবসায়ীর উপনিবেশ। ওপারে ঢালু ব্রহ্মডাঙা—শস্যহীন কুশ আর কাঁকরে আকীর্ণ। তারই ভেতর দিয়ে গোরুর গাড়ির ধূলি-মলিন পথ চলে গেছে ষোলো মাইল দূরের রেল-স্টেশনে—ছোট বড় রাঙা মাটির টিলার ওপরে বিচ্ছিন্ন তালগাছগুলো নিঃসঙ্গতার বিরাট ব্যঞ্জনা।

আলু খলিফার ভালো লাগল জায়গাটা। আকাশে বাতাসে, ভাষায় মানুষে আর সীমাহীন শূন্যতায় কোথায় যেন তার দেশের সঙ্গে মিল আছে এর। তা ছাড়া ফেরারীর পক্ষে এর চাইতে নিরাপদ জায়গা আর কী কল্পনা করা চলে। সংসারে অবলম্বন তার দুটি ছেলে—দুজনেই গেছে যুদ্ধ করতে, কোনো দিন ফিরবে

কিনা কেউ জানে না। সুতরাং স্বচ্ছন্দ মনে জীবনের বাকী দিন কটা এখানে বানপ্রস্থ যাপন করতে পারে আলু খলিফা।

দিন কয়েকের মধ্যেই বন্দরের এক পাশে গড়ে উঠল ছোট একটা মাংসের দোকান। যে ভোজালি সে রাগের মাথায় গ্রেট মোগলাই হোটেলের ম্যানেজারের বুকে বসিয়ে দিয়েছিল এবং অন্ততঃ সাতটি মানুষের রক্ত-কণিকা যার বাঁটে অনুসন্ধান করলে খুঁজে পাওয়া যায়—সেই ভোজালি দিয়ে কচাকচ খাসির গলা কাটতে সুরু করে দিলে। মানুষ আর খাসির মধ্যে তফাৎ নেই কিছু, কাটবার সময়ে একই রকম মনে হয়। তা ছাড়া প্রথম মানুষ মারবার যে উত্তেজনা, লক্ষ্ণৌ শহরে দু তিনটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে সে উত্তেজনা ভোঁতা হয়ে গেছে। মানুষ কাটলে ফাঁসির ভয় আছে, কিন্তু পশুর বেলায় তা নেই। অতএব অর্থকরী এবং নিরাপদ দিকটাই বেছে নেওয়া ভালো।

বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে নতুন জীবন। দৈনিক একটা খাসি—কখনো বা একটা বকরী জবাই দেয় আলু। রুদ্ধকণ্ঠ পশুটার শ্বাসনালী বিদীর্ণ করে দেয় তীক্ষ্ণধার ভোজালি—তীরের মতো ধারায় ছুটে যায় রক্ত—মুমূর্ষু অহিংস জীবন মাটিতে লুটিয়ে ছট্‌ফট্‌ করে। অদূরে দাঁড়িয়ে পরিতৃপ্ত চোখে আলু লক্ষ্য করে তার মৃত্যু-যন্ত্রণা। রক্ত আর ধূলোর মিলিত কটু গন্ধ ছড়িয়ে যায় আকাশে। খচখচ করে চলতে থাকে

অস্ত্র। তারপর দড়ি ঝোলানো ছোট বড় মাংসখণ্ড ক্রেতাদের লোভ বর্ধন করে।

—কত করে সের, ও খলিফা?

—বারো আনা।

—বারো আনা। এ যে দিনে ডাকাতি।

ডাকাতি! আলু খলিফা হাসে। ডাকাতির কী জানে এরা, বোঝেই বা কতটুকু। করকরে খানিকটা প্রবল হাসিতে মুখরিত করে দেয় চারদিক।

—সেরা খাসি বাবু, থক্থকে তেল। কলকাতা লক্ষ্ণৌ হলে সের হত আড়াই টাকা।

নানা জাতের খদ্দের আসে। হিন্দুস্থানী নিরামিষাশী ব্যবসাদারেরা লোক পাঠিয়ে গোপনে মাংস কেনে। কাঁধে কাছিম ঝুলিয়ে, বাঁশের দোলায় শূয়োর নিয়ে হাট-ফিরতি ওঁরাও, তুরী কিংবা সাঁওতালেরাও এক আধ সের মাংস নিয়ে যায়। ভোজালীর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মাংস-কাটা কাঠটার নীচে জমে ওঠে রক্তমাখা সিকি আধুলি, এক টাকার নোট। বারোটার মধ্যেই বিক্রী-পাটা শেষ হয়ে যায় আলু খলিফার।

সন্ধ্যায় জগদীশের দোকান: এক বোতল তিরিশের মদ—ছিলিম তিনেক গাঁজা। জগদীশের সঙ্গে আলুর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আজকাল—এ রকম শাঁসালো খরিদ্দার দুর্লভ।

বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ মাঝে মাঝে আলু জগদীশকে মাংস খাওয়ায়।

রাত ঘন হয়ে আসে। গ্রাম্য বন্দরের দোকানগুলো একটার পর একটা ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। মদের দোকান থেকে ফিরে আসে আলু। কোনোদিন খাওয়া হয়, কোনো দিন হয় না। রক্ত আর ক্লেদের ওপরে সেঁতসেঁতে চট বিছিয়ে আলু তার ওপরে এলিয়ে পড়ে। বাসি মাংসের গন্ধ ঘরময় ভেসে বেড়ায়, হাওয়াতে দড়িবাঁধা খাসির শেষাংশটুকু ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এদিকে ওদিকে দুলতে থাকে। নদীতে হিন্দুস্থানী মাল্লাদের ঢোলের শব্দ আর উদ্দাম চীৎকার শান্ত হয়ে আসে। শুধু বালুচরে থেকে থেকে গাং-শালিক কেঁদে ওঠে: ট্রি—ট্রি—ট্রি—ট্রি—হট্—ট্রি—ট্রি—ট্রি—

* * *

আলু খলিফা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে লক্ষ্ণৌ শহরের। দাঙ্গা বেধেছে। আল্লা-হু-আকবর। লাঠির ঠকাঠক শব্দ—মানুষের চীৎকার—লেলিহান আগুন। হাতের ভোজালি বাগিয়ে ধরে ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল রক্তলোলুপ বন্য জন্তুর মতো। বিদ্যুতের মতো ঝলকে উঠল ভোজালি। খাসির গলা নয়—মানুষের বুক। ফিন্কি দিয়ে রক্ত এসে আলুর দুখানা হাতকে রাঙিয়ে দিয়েছে।…

জগদীশ ছাড়া আরো দুটি বন্ধু জুটেছে আলু খলিফার।

একটি ছোট মেয়ে—রামতুলারী তার নাম। তার বাপ বাজারে কী এক হালুয়াই দোকানের কারিগর। মাংস কিনতে আসে না —মাংস কিনবার পয়সা নেই। মাঝে মাঝে দূরে দাঁড়িয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়।

স্নেহ-ভালোবাসা বলে কোনো জিনিষ নেই আলুর জীবনে। তবু এই মেয়েটাকে তার ভালো লাগল। বছর পাঁচ ছয় বয়েস, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। কালো রঙের ওপরে সুঠাম মুখশ্রী। গলায় কাচের মালা—হাটের শেষে একটা কেরোসিনের টেরি জ্বালিয়ে রাত করে পয়সা খুঁজে বেড়ায়। কী পায় কে জানে, কিন্তু সাধনার বিরাম নেই।

আলুই নিজে থেকে যেচে আলাপ করে নিয়েছে ওর সঙ্গে। প্রথম প্রথম কাছে আসতে চায়নি, রক্ত-মাংসের মাঝখানে ওই অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর মানুষটাকে দেখে ছুটে পালিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে তার পরে সহজ হয়ে এসেছে সমস্ত।

সকালে ঝাঁকড়া চুল তুলিয়ে দেখা দেয় ধূলি-মলিন রামতুলারী।

—আজকে কটা বক্‌রি বানালে চাচাজী?

—তুনিয়ার তামাম মানুষ বক্‌রি হয়ে গেছে বেটি, তাই বক্‌রি আর বানাই না। তা হলে তো দেশভর লোককে জবাই করতে হয়। তাই খাসি কেটেছি।

রামতুলারী কথাটা বুঝতে পারে না। বড় বড় বিস্ফারিত

চোখ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে চাচাজীর মুখের দিকে। বলে ত্নিয়ার সব লোক বক্‌রি ?

—বক্‌রি বৈ কি। কিন্তু সে থাক। মাটিয়া লিবি বেটি ? এই নে—ভালো মাটিয়া রেখেছি তোর জন্যে। এক পোয়া আধ পোয়া মেটে প্রকাণ্ড মুঠিতে যা ওঠে, কলাপাতার ঠোঙ্গায় করে রামত্নলারীর হাতে তুলে দেয় আলু খলিফা। ভালো লাগে রামত্নলারীকে—ভালো লাগে এই দাক্ষিণ্যটুকু। বাংলা দেশের মাটিতে পা দিয়ে বাংলার স্নেহ-স্নিগ্ধ কোমলতা তার চেতনায় মায়া ছড়িয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের একটা মেয়ে থাকলে খুশি হত সে।

আর একটি বন্ধু জুটেছে—তার নাম বন্‌শীধর। আড়তদার মহাবীরপ্রসাদের ছেলে। কুড়ি বাইশ বছর বয়স—এর মধ্যেই সব রকম নেশায় সিদ্ধহস্ত। আলুকে সে তার দোসর করে নিয়েছে।

ফলে এই হয়েছে যে জগদীশের দোকানে আলুকে আর গাঁটের কড়ি খরচ করতে হয় না। বন্‌শীধর নিয়মিত তার নেশার খরচ যোগায়। হাতে প্রকাণ্ড ভোজালি নিয়ে বন্‌শীধরের দেহরক্ষীর মতো তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আলু খলিফা। চরিত্রগুণে বন্‌শীধরের শক্রর অভাব নেই, কিন্তু তার সহচরের দিকে চোখ পড়তেই শত্রুপক্ষের যা কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সব প্রশমিত হয়ে যায়।

অত্যন্ত খুশি হয় বনশীধর। বলে, প াশ টাকা মাইনে দেব তোমাকে খলিফা, তুমি আমার খাস বরকন্দাজ বনে যাও।

প্রকাণ্ড মুখে করকরে হাসি হাসে আলু খলিফা।

—কোনো দিন গোলামী করিনি, আজও করব না। তুমি আমার দোস্ত আছো এই ভালো।

দিন কাটছিল—নিস্তাপ নিরুত্তেজ জীবন। আলুর মন থেকে মুছে আসছিল অতীতের যা কিছু স্মৃতি। কোথায় কত দূরে লক্ষ্ণৌ শহর—কোথায় সে সব হিংস্র উন্মত্ত দিন। চোখ বুজে ভাবতে গেলে সত্যকেই এখন স্বপ্ন বলে বিভ্রম এসে যায়। এই ঝাঁপ-ফেলা ছোট দোকান। সামনে বন্দর—টিনের চাল, খড়ের চাল, ছোট ছোট ফড়িয়া আর পাইকার। সকলের ওপরে জেগে আছে মহাবীরপ্রসাদের হলদে রঙের দুতলা বাড়ীটা। প্রতিদিনের চেনা নির্বিরোধ সমস্ত মানুষের মুখ, ধুলোর গন্ধ, বেনেতি মসলার গন্ধ, খাসির রক্ত আর বাসি মাংসের গন্ধ, জগদীশের দোকানে মদের গন্ধ। বাবলা গাছের তলা দিয়ে, কাঁকর আর কুশের তীক্ষ্ণাগ্রে আকীর্ণ দিক্-প্রান্তের মধ্য দিয়ে তেমনি করে বয়ে যায় ক্ষীণস্রোতা নদী। নিশীথ রাত্রে তেমনি করে গাং-শালিকের ডাক: ট্রি-ট্রি-ট্রি—হট—ট্রি-ট্রি-ট্রি—

মায়া বসে গেছে এখানে—মায়া বসে গেছে এখানকার স্বল্লাবর্তিত সংকীর্ণ জীবনের ওপরে। স্বপ্নের মধ্যে সহস্র গলার

আল্লা-হু-আকবর আর রক্তকে ফেনিল করে তোলে না—রামতুলারীর মিষ্টি হাসি আর কচি মুখখানা ভেসে বেড়ায় চোখের সামনে। বয়স বেড়েছে আলু খলিফার। নিত্যসঙ্গী ভোজালির চওড়া ফলাটা ক্ষয়ে এসেছে আর তেমনি করে দিনের পর দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে মনের সেই পাশবিক উগ্রতা, সেই আদিম হিংস্রতার খর-নখরগুলো।

* * *

দিন কাটছিল—কিন্তু আর কাটতে চায় না। বাংলা দেশে মন্বন্তর এল।

পূর্ব-দিগন্ত থেকে, পশ্চিমের রণাঙ্গন থেকে কার একখানা আকাশজোড়া মহাকায় থাবা বাংলা দেশের ওপরে এসে পড়ল. নেই-নেই-নেই! তার পরে কিছুই নেই। তারও পরে দেখা গেল শুধু একটা জিনিষ মাত্র অবশিষ্ট আছে—সে মৃত্যু। প্রতীকারহীন, উপায়হীন তিল তিল মৃত্যু।

প্রথম প্রথম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করত আলু খলিফা ঃ দেশের এ কী হল ভাই ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর আসত ঃ যুদ্ধ।

যুদ্ধ—জং। কিন্তু জং তো আজকের দিনের ব্যাপার নয়, তারই তুই ছেলে তো জঙ্গী হয়ে জার্মাণ ঘায়েল করতে গেছে। এত দিন এই সর্বাঙ্গীণ অভাব কোথায় লুকিয়েছিল! তা ছাড়া

ছোটখাটো যুদ্ধ সেও না করেছে এমন নয়। সেই সব দাঙ্গা —লাঠির শব্দ—মশালের আলো যুদ্ধ ছাড়া আর কী হতে পারে? কিন্তু এমন সর্বব্যাপী অভাবের মূর্তি তো চোখে পড়েনি কখনো।

খাসির দর বাড়ল—মাংসের দর বাড়ল। এক পোয়া আধ পোয়ার খদ্দেররা আর এ পথ মাড়ায় না। দলে দলে দেহাতি লোক বন্দরে আসে, ভিক্ষা চায়, কাঁদে, হাটখোলার পাশে পাশে পড়ে মরে যায়। দিনের বেলাতেই শেয়াল-কুকুরে মড়া খায় এখানে ওখানে। যুদ্ধ।

নেই-নেই কিছুই নেই। সাধারণ মানুষ যেন মৃত্যুর সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে লড়াই করে দিন গুজরান করে। এ এক আচ্ছা তামাসা—এও এক জং। আলু খলিফার বুকের রক্তে চন্ চন্ করে ওঠে উত্তেজনা। প্রতিপক্ষকে যেখানে চোখে পায় না অথচ যার অলক্ষ্য মৃত্যুবাণ অব্যর্থ ভাবে হত্যা করে চলেছে—তাকে হাতের কাছে পাওয়ার জন্যে একটা হিংস্র কামনা অনুভব করে আলু।

এক পোয়া আধ পোয়ার খদ্দের নেই, কিন্তু দুসের আধ সেরের খদ্দের বেড়েছে। একটার জায়গায় দুটো খাসি জবাই করতে হয়, হাটবারে চারটে। আলু একা মানুষ—অভাব বোধ তার কম, তবুও অভাব এসে দেখা দিয়েছে। দামী মাংসের দামী খদ্দের বেড়েছে, জগদীশের দোকানে সন্ধ্যায় আর বসবার

জায়গা পাওয়া যায় না। বন্‌শীধর টাট্‌কা সিল্‌কের পাঞ্জাবী পরে, দোক্তা-দেওয়া পান চিবোয় ; মদের জন্যে নির্বিকার মুখে নোটের পর নোট বার করে। সমস্ত জিনিষটা গোলকধাঁধা বলে মনে হয় যেন। এত টাকা বেড়েছে বন্‌শীধরের, টাকা বেড়েছে হনুমানপ্রসাদের, টাকা বেড়েছে আড়তদার গোলাম আলীর, কিন্তু এত মানুষ না খেয়ে মরে যায় কেন !

দাঙ্গায় মানুষ মারতে ভালো লাগে—যে মানুষের রক্ত উদ্বেলিত—হৃতপিণ্ড উত্তেজনায় বিস্ফারিত। কিন্তু যাদের অস্থিসার দেহ টুকরো টুকরো করে কাটলেও এক বিন্দু ফিকে জোলো রক্ত বেরিয়ে আসবে না, তাদের এই মৃত্যু দুঃসহ বলে মনে হয়। আলু খলিফার অস্বস্তি লাগে।

বন্‌শীধর আজকাল বিষয়কর্ম্মে মন দিয়েছে। প্রায়ই বাইরে থাকে, শহরে যায়, ইষ্টিশনে যায়, আরো কোথায় ছুটে বেড়ায়। তারপর এক দিন দেখা দেয় অতিশয় প্রসন্নমুখে। গায়ে পাটভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে গ্লেজ-কিডের জুতো, মুখে সুর্তি দেওয়া পান আর সিগারেট। মদের দোকানে খুলে দেয় সদাব্রত।

—তারপরে—তামাম চীজ পাচ্ছ তো খলিফা ?

—কই আর পাচ্ছি।—বোকার মতো মুখ করে তাকায় আলু খলিফা। বড় বড় দুটো আলুর মতো আরক্তিম চোখ মেলে তাকিয়েই থাকে বনশীধরের পানের কষ-রাঙানো পুরু

পুরু ঠোঁটের দিকে। ভাই, এ কি হল বংলা মুলুকের হাল-চাল!

পুরোনো প্রশ্নের পুরোনো জবাব সংক্ষেপেই দেয় বন্‌শীধর; লড়াই।

—লড়াই! কিন্তু তোমরা এত টাকা পাচ্ছ কোথা থেকে?

—খোদা মানো? যাকে দেয় ছাপ্পর ফুঁড়ে দেয়।

—তা বটে।

কিন্তু খোদা মানলেও কার্য-কারণ সম্বন্ধে তো একটা থাকা দরকার। লক্ষ্ণৌ শহরের এ টার্শভ গুণ্ডা অনেক বুঝতে পারে, কিন্তু এই সোজা কথাটা বুঝতে পারে না কিছুতেই। জীবনের গতি তার প্রত্যক্ষ আর সরল। বাহুবলে, অস্ত্রবলে উপভোগ করো সমস্ত। কেড়ে নাও, ছিনিয়ে নাও, রাহাজানি করো, মানুষ মারো। কিন্তু রাহাজানি নেই—হাঙ্গামা নেই, অথচ টাকা আসছে আর মানুষ মরছে। হাঁ—একেই বলে তগদীর। খোদা দেনেওলাই বটে।

ছিন্নকণ্ঠ খাসির রক্তে দোকানের সামনে মাটিটা শক্ত কালো পাথরের মতো চাপ বেঁধে গেছে। কিন্তু এত মানুষ যে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে মরে গেল, তাদের রক্ত জমল কোথায়? এই হাজার হাজার মানুষের রক্তে সমুদ্র তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে কোন্‌খানে?

তারপর একদিন আলু খলিফার খেয়াল হল আজ অনেক দিন রামদুলারী তার দোকানে আসেনি। চাচাজীর কাছ থেকে

মেটে চেয়ে নিয়ে যায়নি কলাপাতার ঠোঙ্গায়। কী হল রামদুলারীর ?

মনে পড়ল শেষ যেদিন এসেছিল, সেদিন মেটে চায়নি। চেয়েছিল আধ সের চাল : চাচাজী, কাল সারাদিন আমাদের খাওয়া হয়নি।

বারো আনা দিয়ে আলু চাল কিনে দিয়েছিল রামদুলারীকে। কিন্তু পরদিন থেকে আর আসেনি রামদুলারী। নানা বিড়ম্বনা, বন্দরের পথে ঘাটে মড়া, সন্ধ্যায় জগদীশের দোকানে বন্‌শীধরের টাকায় মদের অবাধ স্রোত—কালো মেয়েটার কথা ভুলেই গিয়েছিল একেবারে। কিন্তু সকালে দোকানের ঝাঁপ খুলতে গিয়ে সমস্ত মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সত্‌নারাণ হালুয়াইয়ের ঘর বন্দরের বাইরে। আলু বেরিয়ে পড়ল রামদুলারীর সন্ধানে।

সত্‌নারাণের অবস্থা খারাপ, কিন্তু এত যে খারাপ আলু তা জানত না। ভাঙা খোড়ো ঘর দাঁড়িয়ে আছে অসহায় ভাবে, নদীর বাতাসে তার চালটা কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। বারান্দায় একটা ভাঙা খাটিয়া, তার ওপরে আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদছে সত্‌নারাণ হালুয়াইয়ের বউ।

—রামদুলারী কাঁহা—রামদুলারী ?

সত্‌নারাণের বউ আরও তারস্বরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। নামজাদা গুণ্ডা আলু খলিফার বুক কাঁপতে লাগল—জীবনে এই

প্রথম ভয় পেয়েছে, এই প্রথম আশংকায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে।

—কী হয়েছে, কোথায় রামতুলারী ?

রামতুলারী নেই।—হাঁ—সত্যিই সে মরে গেছে। ভারী অসুখ হয়েছিল, কিন্তু এক ফোঁটা দাওয়াই জোটেনি! মরবার আগে চেঁচিয়েছে ভাত ভাত করে। গলা বসে গেছে—কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে দুটো মুমূর্ষু চোখ—চিঁ চিঁ করে আর্তনাদ করেছে ভাতের জন্যে। কিন্তু ভাত জোটেনি—কোথায় ভাত ? রামতুলারী মরে গেছে। তার মুখে আগুন ছুঁইয়ে শীর্ণ দেহটাকে নদীর জলে গাংসই করে দিয়ে এসেছে বাপ সত্‌নারাণ।

টলতে টলতে চলে এল আলু খলিফা। সে খুন করবে—বহু দিন পরে খুন করবার প্রেরণায় তার শিরাস্নায়ুগুলো ঝমর ঝমর করে উঠেছে। খুন করবে তাকেই—যে রামতুলারীকে মেরে ফেলেছে, শুষে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সেই অদৃশ্য শত্রুকে—যার অলক্ষ্য মৃত্যুবাণ অব্যর্থ লক্ষ্যে হত্যা করে চলেছে ? কোথায় সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ? ভোজালির সীমানার মধ্যে তাকে পাওয়া যায় কী করে ?

জগদীশের দোকান। আলুর মুখ দেখে জগদীশ চমকে গেল।

—কী হয়েছে খলিফা ?

আলু সে কথার জবাব দিলে না। শুধু বললে, একটা বোতল।

—এই অসময়ে !

আলু চেঁচিয়ে উঠল কদর্য একটা গাল দিয়েঃ তাতে তোমার কী !

জগদীশ আর কথা বাড়ালো না। নিঃশব্দে বোতল খুলে দিলে আলুর দিকে ! কী যেন হয়েছে লোকটার—এমন মুখ, এমন চোখ সে আর কখনো দেখেনি। যেন থম থম করছে ঝড়ের আকাশ।

এক বোতল—তু বোতল। আলু কাঁদতে জানে না, তার চোখের জল আগুন হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। খুন করবে, খুন করবে সে। কিন্তু কোথায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী—তার শত্রু।

গা টলছে, মাথা ঘুরছে। বহুদিন পরে আজ আবার নেশা হয়েছে আলুর। এমনি নেশা হয়েছিল সেদিন যেদিন গ্রেট মোগলাই হোটেলের ম্যানেজারের বুকে সে তার ছোরাখানা বিঁধিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ কী মনে হল—আরক্ত আচ্ছন্ন চোখ মেলে সে জগদীশকে লক্ষ্য কয়তে লাগল। একে দিয়েই আরম্ভ করবে না কি ? জগদীশের পেটে বাঁট শুদ্ধ বসিয়ে দিয়ে প্রথম শাণ দেবে ভোজালিতে ?

আলু চিন্তা করতে লাগল।

কিন্তু নিছক পিতৃপুরুষের পুণ্যেই এ যাত্রা জগদীশের ফাঁড়া কেটে গেল। গ্লেজ-কিড জুতো মচমচিয়ে ঘরে ঢুকল বন্শীধর।

উল্লসিত কণ্ঠে বন্‌শীধর বললে, কী খবর খলিফা, এই সাত-সকালেই মদ গিলতে বসেছ।

আলু বললে, আমার মর্জি।

একটা বড় কন্‌সাইন্‌মেণ্টের টাকা হাতে এসে পৌঁচেছে—অত্যন্ত প্রসন্ন আছে বন্‌শীধরের মন ঃ তা হলে এসো, এসো, আরো চালান যাক্।

জগদীশ বললে, দু' বোতল গিলেছে কিন্তু—

আলু গর্জে উঠল ঃ দশ বোতল গিলব—তোমার মুণ্ডু শুদ্ধু গিলব আমি।

—দশ বোতল কেন, ভাঁটিটাই গিলে ফেল না। কিন্তু দোহাই বাবু, আমার মুণ্ডুটাকে রেয়াৎ কোরো দয়া করে—জগদীশ রসিকতার চেষ্টা করলে একটা।

বন্‌শীধর হেসে উঠল, কিন্তু আলু হাসল না। চোখের জল আগুন হয়ে ঝরে যাচ্ছে! কে মেরে ফেলেছে রামদুলারীকে কে কেড়ে নিয়েছে তার রোগের দাওয়াই, তার মুখের ভাত? কোথায় সেই শত্রুর সন্ধান মিলবে?

বোতলের পর বোতল চলতে লাগল। শরীরে আর রক্ত নেই—বয়ে যাচ্ছে যেন তরল একটা অগ্নি-নিঃস্রাব। বন্‌শীধরের কাঁধে ভর দিয়ে জীবনে এই সর্বপ্রথম আলু মদের দোকান থেকে বেরিয়ে এল। এই প্রথম এমন নেশা হয়েছে তার—এই প্রথম তার পরের ওপরে নির্ভর করতে হয়েছে।

চলতে চলতে আলু জড়ানো গলায় বললে, বলতে পারো দোস্ত, চাল গেল কোথায় ?

—চাল ?—বন্‌শীধরের নেশাচ্ছন্ন চোখ দুটো পিট পিট করতে লাগল। অর্ধচেতন এই মানসিক অবস্থায় আলু অনেকখানি বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে তার কাছে। একটা বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে যাচ্ছে—এম্‌নি ফিস্ ফিস্ করে চাপা গলায় বন্‌শীধর বললে, দেখবে কোথায় চাল ?

—দেখব।—প্রতিটি রোমকূপে অগ্নিস্রাব যেন লক্ষ লক্ষ শিখা মেলে দিয়েছে : দেখব আমি।

* * * *

বন্‌শীধরের অন্ধকার গুদামের ভেতর থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ। লোকজন ছুটে এল ঊর্ধ্বশ্বাসে, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল। স্তূপাকার চালের বস্তার উপরে চীৎ হয়ে পড়ে আছে বন্‌শীধর—রক্তে ভেসে যাচ্ছে চার দিক। আর তারই হাঁটুর ওপরে বসে ভোজালি দিয়ে নিপুণ কশাইয়ের মতো আলু খলিফা তার পেটটাকে ফালা ফালা করে কাটছে—বন্‌শীধরের মেটে বার করবে সে। মানুষ আর খাসির মধ্যে কোন তফাৎ নেই —কাটতে একই রকম লাগে।

এতদিন ঘাতকের মতো মানুষের প্রাণ নিয়েছে আলু খলিফা—কিন্তু কেউ তার কেশাগ্র স্পর্শ করেতেও পারেনি। কিন্তু যেদিন সে খুনের প্রথম অধিকার পেল, সেদিনই সে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে।

ঘূর্ণি

ক্রমশ দূর চক্রবালে বন্দরের আলো অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া আসিল। তার পরেই নীরন্ধ্র অন্ধকার এবং অতল-স্পর্শ জলধারা ছাড়া দক্ষিণে ও বামে কোন কিছুই আর দেখিবার রহিল না। উজানের মুখে সির সির করিয়া খানিকটা বাতাস দিতেছিল বটে, কিন্তু মন্থর স্রোতে নৌকা সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। পদ্মার উপর দিয়া কোনাকুনি পাড়ি জমাইলে লক্ষ্মীপুরের বাজার, সেখান হইতে কুমারহাটির খাল বাহিয়া আরও কয়েকঘণ্টার পথ। অর্থাৎ বাড়ী পৌঁছিতে সকাল হইয়া যাইবে।

বিশাল পদ্মা আর অনন্ত আকাশ—মাঝখানে অন্ধকারের একটি ছেদহীন আবরণ যেন একটা সীমাহীন অখণ্ডতায় ইহাদের একাকার করিয়া দিয়াছে। দাঁড় টানিবার এবং ফেলিবার নিয়মিত ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কালো জলে জলতরঙ্গ বাজাইয়া নৌকা কোন একটা অনির্দেশ লক্ষ্যের পানে আগাইয়া চলিয়াছে। কপালের উপর হাত রাখিয়া চোখের দৃষ্টি একাগ্র তীক্ষ্ণ করিয়া চাহিলেও এপারে ওপারে একটা গাছপালা বা আলোর আভাস চোখে পড়ে না। এ বছর বান হইয়াছে অস্বাভাবিক এবং প্রমত্ত পদ্মা আত্মবিস্তারের সময় যেন

মাত্রা রাখিতে চায় নাই। মাঝিরা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পাড়ি জমাইয়াছে, একবার ওপারের তীরে ধরিতে পারিলে যেমন করিয়াই হ'ক লক্ষ্মীপুরের বাজার খুঁজিয়া নেওয়া শক্ত হইবে না।

যে দুইজন দাঁড় টানিতেছিল, তাহাদের একজন বলিল, "একটু সামলে চলিস ভাই, বড় পাকটা কাছেই আছে।"

হাল হইতে উত্তর আসিল "ভয় নেই, টেনে যা। সে আরও ঢের দক্ষিণে অনেক নীচে।"

ছইয়ের বাহিরে আসিয়া হুঁকা টানিতে টানিজে মথুর ঘোষাল অনেক কথাই ভাবিতেছিল। কতদিন পরে বিদেশ হইতে দেশে ফিরিতেছে সে—আত্মীয় পরিজনেরা তাহাকে দেখিয়া যে কি পরিমাণে আনন্দিত হইবে সে কথা কল্পনা করিয়াও সে পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই তাহার ভাবনায় বাধা পড়িয়া গেল। অন্ধকারে তাকাইয়া তাকাইয়া তাহার দৃষ্টি অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া গেছে ; তা ছাড়া নক্ষত্রখচিত আকাশের ছায়া পদ্মার ঘোলাটে জলে প্রতিফলিত হইয়া একটা তরল আলোক দীপ্তির মত যেন গতিশীল জলের উপর নাচিতেছিল। সে আলোকে মথুর দেখিয়া বলিল,—"একখানা নৌকা আসছে না এদিকে ?"

পিছন ফিরিয়া যাঁরা দাঁড় টানিতেছিল তাহারা দেখে

নাই, কিন্তু হালের মাঝি লক্ষ্য করিয়াছিল। সন্দিগ্ধ হইয়া কহিল, "হাঁ একখানা বড় নৌকা আসছে কর্তা। কিন্তু আলো নেই কেন? এই রাত্তিরে গাঙ পাড়ি দিচ্ছে অথচ—" দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে সে থামিয়া গেল।

ভয়ে এবং সংশয়ে মথুর ঘোষালের গলা ও বুক শুকাইয়া উঠিল।

"হাঁ রে, এ তল্লাটে ভয় নেই তো কোন রকম?"

"নেই তা কী ক'রে বলব কর্তা। জল পুলিশ ঘুরে বেড়ায় বটে, কিন্তু ছু-চারটে ডাকাতির খবর তো হামেশাই পাওয়া যায়।"

"বলিস কিরে!" ভয়ে মথুরের প্রায় কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম। রাত্রির এই স্নিগ্ধভরা শীতল বাতাসেও তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। ভাঙা গলায় কহিল, "হাঁক ডাক করব?"

যে ছুইজন দাঁড় টানিতেছিল তাহারা দাঁড় বন্ধ করিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিল। একজন নীরস ভাবে কহিল, "এত রাত্তিরে মাঝ নদীতে হাঁকাহাঁকি ক'রে লাভ নেই কর্তা। এ বড় বিষম জায়গা। ধারে কাছে ছু-একখানা এক মাল্লাই থাকলেও এখন তারা কিছুতেই ভিড়বে না।"

হালের মাঝির রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, সে কহিল, "চইর বাগিয়ে ধর মকবুল। যদি ডাকাতই হয়—"

মকবুল সংক্ষেপে শান্ত স্বরে উত্তর দিল, "খেপেছ ইয়াকুব চাচা!"

বাস্তবিক তাহাদের স্বার্থইবা ইহাতে কতটুকু! তাহাদের অতি দীন, ছিন্ন, জীর্ণ দুই চারিটি তৈজসপত্র যে কাহাকেও দস্যুতার লোভে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারে সে কথা বিশ্বাস করিবার নয়। অনর্থক পরের জন্য লড়িতে গিয়া তাহারা মৃত্যু ডাকিয়া আনিবে কেন!

ইতিমধ্যেই ছিপের মত দীর্ঘ আকারের একখানা কালো নৌকা তাহাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে—জলের উপর দিয়া তাহা উড়িয়া আসিতেছে যেন। মকবুল হাঁকিয়া কহিল, "নৌকা সামাল—আপন ডাইন।"

আপন ডাইনে নৌকা সামলাইবার কোনও গরজ কিন্তু তাহাদের দেখা গেল না। তাহার পরিবর্তে কর্কশ গলায় প্রশ্ন আসিল, "ভাড়া কোথাকার?"

ইয়াকুব উত্তর দিল, "কুমারহাটি।"

"কুমারহাটি? বেশ, বেশ। তা একটু তামাক খাওয়াতে পার মিঞা?"

মকবুল চড়া সুরে বলিল, "না' তামাক আমাদের নেই।"

ও নৌকা হইতে উত্তর আসিল, "আছে দাদা, আছে, কেন কথা বাড়াচ্ছ. ভাল মানুষের মত হুঁকোটা বাড়িয়ে দাও, এক ছিলিম টেনে নিই।"

খট্‌-খট্‌-খটাং—ও নৌকা সোজা আসিয়া এ নৌকার গায়ে ভিড়িয়া গেল।

ইয়াকুব গর্জিয়া কহিল, "গায়ে এসে পড়লে যে? তফাৎ যাও—তামাক আমরা খাইনে, হুঁকোটুঁকো আমাদের নৌকোয় হবে না।"

—"থাম হে সুমুন্দী, আস্তে। ভাল কথায় তো দেবার পাত্তর নও, বাঁকা অঙ্গুলেই ঘি ওঠাতে হবে। আচ্ছা, তামাক তোমাদের দিতে হবে না, আমরা খুঁজে নিচ্ছি।"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা আর অবকাশ দিল না। মুহূর্তে তিন চারজন প্রায় একসঙ্গেই এই নৌকায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। একটা প্রচণ্ড দোলা খাইয়া নৌকাটা ঠিক হতে না হইতেই তাহারা দেখিতে পাইল ঠিক চোখের সামনেই একখানা প্রচণ্ড রামদার তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল দেহ এবং তিন-চারখানা সড়কির ক্ষুধার্ত ফলক অন্ধকারের মধ্যে ঝকিয়া উঠিতেছে। মনে হইল পদ্মার অতল জল ফুঁড়িয়া একদল প্রেতমূর্তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সকলের আগে যে ছিল সে বিশাল বাবরি নাচাইয়া এবং রামদাখানাকে বার কয়েক মাথার উপর ভাঁজিয়া লইয়া কহিল, "ভালো চাও তো বের করে দাও সব। একটু সাড়া শব্দ ক'রেছ কি টুকরো টুকরো ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব।"

মথুর অস্ফুটভাবে কি একটা হাঁউমাউ করিয়া উঠিতে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই সে অনুভব করিল, তাহার ঠিক হৃৎপিণ্ডের

উপরটিতে বুকের চামড়ায় আলপিনের মতো তীক্ষ্ণ মৃদু অনুভূতি —ল্যাজার একটা দীর্ঘ ফলক অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জায়গাটি স্পর্শ করিয়া আছে।

"চুপ! নইলে এক্ষুণি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে ফেলব।"

মথুর বলির পাঠার মত কাঁপিতে লাগিল। লুট-পাট শুরু হইয়া গেল। বাক্স বিছানা হইতে আরম্ভ বরিয়া জার্মান সিলভারের পান খাইবার ছোট কৌটাটি অবধি তাহারা লইতে ভুলিল না। স্পর্শ করিল না শুধু মাঝিদের ছেঁড়া বিছানা, গোটা দুই লোহার কড়াই এবং তিন-চারখানা কলাইকরা এনামেলের থালা।

মাঝিরা গলুইয়ের উপর পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ মকবুল যেন অচেতন হইয়া উঠিল, সন্ত্রস্ত স্বরে প্রশ্ন করিল, "জলে এত টান কিসের ইয়াকুব চাচা?"

টান! এতক্ষণে সেদিকে সকলের খেয়াল হইল। সত্যই তো প্রবল একটা স্রোতের টানে নৌকা দু'খানা যেন ঝড়ের পালে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ টান স্বাভাবিক টান নয়, পদ্মার স্রোত হইতে এ স্রোত অনেক প্রখর!

সমস্ত অবস্থাটাই যেন এক মুহূর্তে বিবর্তিত হইয়া গেল। রামদা লইয়া ইহাদের এতক্ষণ সে শাসাইতেছিল তাহার হাত হইতে উদ্ধত অস্ত্র নামিয়া আসিল, ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে সে কহিল, "বড়পাকের টান!"

বড়পাকের টান ! পদ্মার উত্তরাঞ্চলে সে পাকের খ্যাতি কে না শুনিয়াছে ! চুম্বক যেমন একটা অনিবার্য আকর্ষণে লোহাকে কাছে টানিয়া আনে, তেমনি এই বড় পাকও বহুদূর হইতে নৌকা বা যা কিছু পায়, সকলের অজ্ঞাতেই নিজের বুভুক্ষু জলচক্রের মধ্যে সেগুলিকে গ্রাস করিতে লইয়া আসে। সাপের চোখের মতো তাহার আকর্ষণ-প্রভাব, হুঁশিয়ার মাঝিরা দূর হইতে সে প্রভাব অনুভব করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে, যাহারা পারে না, তাহারা অনিবার্য নিষ্ঠুর আকর্ষণে মোহমুগ্ধের মত ছুটিয়া আসে, বিশাল ঘূর্ণি প্রচণ্ড কয়েকটী আবর্তে কয়েকবার তাহাদের ঘুরাইয়া শেষ করিয়া নিজের অতল গর্ভে তলাইয়া লয়—জলের উপর কোনওখানে একটুকু চিহ্ন রাখিয়া যায় না। তাহার পরে হয়তো দুমাইল দূরে একটা বাঁকের মুখে কয়েকটা দেহ বা একখানি উবুড় করা নৌকা ভাসিয়া ওঠে। নিয়তির মতই ইহা দুর্বার, নির্মম এবং অপ্রতিহত। এই পাকের টানে একবার পড়িলে কোনও মাঝির সাধ্য নাই যে নৌকা বা প্রাণ বাঁচাইয়া ঘরে আসিতে পারে।

ডাকাতির উত্তেজনাতেই হোক বা নিজেদের অজ্ঞাতেই হোক, কোন অশুভক্ষণে যে নৌকা পাকের টানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা ইহারা বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে পারিল যখন, তখন আর সময় ছিল না। নৌকার গায়ে আঘাত করিয়া

পদ্মার জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ক্রূর হাসির মত বাজিতে লাগিল।

লুটের মাল যেমন ছিল পড়িয়া রহিল; সড়কি, বল্লম, রামদা ফেলিয়া দুই দলেই দাঁড় টানিতে লাগিল। উজানমুখী যে বাতাসটুকু বহিতেছিল, কোন্ সময় তাহা পড়িয়া গেছে, সুতরাং পাল খাটানো অসম্ভব; আশেপাশে কোথাও তীরের আভাস নাই যে গুণটানা চলে। একমাত্র দাঁড়, হাল এবং বৈঠার উপরে আশ্রয় করিয়াই নৌকার গতি ফিরাইতে হইবে, কিন্তু জলের অপরাজেয় আকর্ষণের কাছে সে চেষ্টা একান্তই অসম্ভব।

নৌকা বাঁচিবে না, বাঁচতেই পারে না। ঝুপঝাপ করিয়া সব জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, কোনও মতে বাহুবলে যদি আত্মরক্ষা করা যায়, যদি কোথাও চড়া বা অন্য কিছুর আকস্মিক একটা আশ্রয় জুটিয়া যায়। নৌকা দু'খানা তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সম্মুখে অনিবার্য মৃত্যু।

* * * *

জলে ঝাপাইয়া পড়িল বটে, কিন্তু স্রোতের টানে কে যে কোন দিকে বুদ্বুদের মত নিশ্চিহ্ন হইল তাহার আর হদিশ মিলিল না। সে আকর্ষণে মথুর ঘোষালও কুটার মত ঘূর্ণির

রাক্ষস গর্ভের দিকে ভাসিয়া চলিল। মনে হইতে লাগিল, পিছন হইতে মৃত্যুদূতের দল শত শত শীতল হাত বাড়াইয়া তাহাকে পাতালের অন্ধকারে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে—ক্ষমা নাই, করুণা নাই। জলের গর্জন ক্রমশই একটা ক্রুদ্ধ জন্তুর ক্রমপরিস্ফুটমান আক্রোশ-ধ্বনির মত বাড়িয়া উঠিতেছে, আহ্বানকারী মৃত্যুচক্র পার কতদূরে?

সাহসা জলের মধ্যে স্থির হইয়া থাকা কী একটা শক্ত জিনিসে মথুরের পা বাধিয়া গেল। দুহাতে সেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে অনুভব করিল পাড় ভাঙ্গিয়া পড়া একটি নারিকেল্ গাছের আশ্রয় সে পাইয়াছে। পাড় কবে ভাঙিয়াছে পদ্মা তীরের সীমানা কতদূরে সরাইয়া নিয়াছে, ঠিক নাই, তবুও নাতি-গভীর জলে, স্রোতের প্রবলটান উপেক্ষা করিয়াও কেবল মাত্র মাথাটুকু জাগাইয়া নারিকেল গাছটা এখনও দাঁড়াইয়া আছে।

পিঠের উপর দিয়া খরস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, আশ্রয় পাইলেও মথুর অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে। বাহুতে যে প্রচুর শক্তি আছে, তাও নয়। আর একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে নিঃসন্দেহে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে নদীর করুণার মুখে।

অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্র করিয়া মথুর বহুকষ্টে নারিকেল গাছের আগায় আসিয়া পৌছিল। জল হইতে মাথাটি হাত

তিনেক মাত্র উপরে ; কিন্তু পাতা বলিতে কিছুই এখন অবশিষ্ট নাই। কালক্রমে শুকাইয়া শুকাইয়া তাহারা পদ্মার জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে ; শুধু দু একটা শুকনো ডাঁটা ন্যাড়া মাথাটার শ্রীবর্ধন করিতেছে মাত্র।

নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ ঘিরিয়া এতক্ষণ অন্ধকারের যে উৎসব চলিতেছিল, এই মুহূর্তে তাহা যেন ফিকা হইয়া আসিতেছে ভাঙা ভাঙা কয়েক টুকরা মেঘের আড়াল হইতে এতক্ষণে চাঁদ উঠিল। খণ্ড চাঁদ, অনুজ্জ্বল আলো, তবু সেই ম্লান করুণ আলোয় পদ্মার এই নিশীথ রূপটাকে আরও রহস্যময়, আরও ভয়ঙ্কর মনে হইতে লাগিল। নারিকেল গাছটা স্রোতের বেগে থর থর করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে, দীর্ঘদিন বর্ষার জলে ডুবিয়া থাকিয়া তাহার দাঁড়াইবার শক্তিও কমিয়া আসিতেছে। ক্রমশ তিল তিল করিয়া তলার মাটি ক্ষইয়া যাইতেছে, যে কোন সময়েই নিঃশেষে উপড়াইয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু সে সব কথা ভাবিবায় মথুরের এমন সময় ছিল না ! শেষ অবলম্বনটুকুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে মুর্ছাতুরের মত পড়িয়া রহিল।

বোধ হয় পাঁচমিনিটও নয়। হঠাৎ সে টের পাইল নারিকেল গাছটায় জোর ঝাঁকুনি লাগিয়াছে ! চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া আর একটি মানুষ তাহারই মতো এই গাছটীকে অবলম্বণ করিয়াছে। তাহার সমস্ত

শরীরটা জলের মধ্যে, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথা এবং দু'খানা বাহু কেবল জলের উপর ভাসিতেছে।

তাহাকে দেখিয়া এত দুঃখের মধ্যেও খানিকটা বিস্ময় ও কৌতুকের হাসি মথুরের মুখে ভাসিয়া উঠিল। রামদা লইয়া এই লোকটাই না শাসাইতেছিল তাহাদের! এতক্ষণ জলে ভিজিলেও তাহাকে চেনা যায়, দীর্ঘ জুলপী এবং সে ঝাঁকড়া বাবরি একবার যে দেখিয়াছে, সে আর সহজে ভুলিবে না। দশ মিনিটের মধ্যেই তাহার বীর পরাক্রম চুপসাইয়া কী হইয়া গিয়াছে! ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মথুর সশব্দে হাসিয়া ফেলিল।

হাসির শব্দে লোকটা চোখ তুলিয়া উপরের দিকে চাহিল এবং চাঁদের আলোয় জামাজোড়া আঁটা মথুর ঘোষালকে সে শুধু দেখিল না, চিনিলও।

"ওঃ! আগে থেকেই তুমি এখানে এসে জুটেছ!" সমস্ত ভয় এবং আতঙ্ক মরণের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মথুরের মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছিল। এমন কি, সময়োচিত এক ধরণের প্রসন্নতাতেও তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিতেছিল যেন।

মথুর শ্লেষ করিয়া কহিল, "সেও তোমাদের দয়ায়। কিন্তু যাত্রা তোমাদের শুভ হয়নি আজকে।"

বাবরি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বড় রকমের

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। পদ্মার প্রবল কলকল্লোলে সে নিশ্বাস মথুর শুনিতে পাইল না।

"হুঁ, সেটা ঠিক। পুলিসের হাতে কয়েকবার পড়েছি, কিন্তু এমন বিপদে আর কখনও পড়ি নি।"

মথুর হাসিয়া কহিল, "দোষ কিন্তু আমাদের নয়।"

"না।" লোকটা হিংস্রভাবে দাঁত দিয়া ঠোঁটটাকে কামড়াইতে লাগিল। "কাল পূর্ণ হয়েছিল আর কি। ধর্মের ঢাক হাওয়ায় বাজে কিনা। বউ কতবার বলেছে এমন কাজ আর কোরো না। এত পাপ ধর্মে সইবে না। সে কথা যদি তখন কানে তুলতাম, তা হ'লে কি এমন অপঘাতে মরতে হয়।"

আশ্চর্য,—এই মুহূর্তে তাহার কণ্ঠস্বরে কী কাতরতাই না প্রকাশ পাইল। বাহির হইতে যতখানি কঠোর বলিয়াই মনে হ'ক, সাধরণের চাইতে দুর্বলতা তো ইহাদের কোন অংশেই কম নয়। বরঞ্চ এমন একটা আকস্মিক আবেগে লোকটির কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল যে, মথুর রীতিমত বিস্ময় বোধ করিল।

সে বলিয়া চলিল, "আষাঢ় মাসে যখন বৌ মরে গেল, তখনই ভেবেছিলুম একাজ ছেড়ে দোব। জমি জিরেত যা আছে তাতে ক'রেই বেশ চলে যাবে। কিন্তু হতভাগা হিরুই নানানখানা ক'রে টেনে নিয়ে এল, বললে, চল্ কালাচাঁদ চল্—"

বোঝা গেল লোকটার নাম কালাচাঁদ। কিন্তু মথুরের

মনে হইল, চাঁদের জায়গায় পাহাড় বসাইয়া দিলেই নামটা তাহাকে মানাইত ভালো।

জল হইতে উপরে উঠিবার চেষ্টা সে করিল, কিন্তু বসিবার জায়গা কোথাও নাই। বৃষ্টি-বাদলে শ্যাওলা পড়িয়া গাছটা পিছল হইয়া আছে, প্রতি মুহূর্তে হাত ফসকাইয়া যাইতে চায়। আগায় ভালো জায়গাটি মথুর অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, কালাচাঁদ একবার ঈর্ষাতুর চোখে সেদিকে চাহিল। পা দুইখানি তাহার তখনও জলের মধ্যে—পদ্মার তীব্র স্রোত সুতীব্র বেগে তাহার উপর দিয়া বাহিয়া যাইতেছে ; হাতের মুষ্টি একটু শিথিল হইলেই টানিয়া লইয়া যাইবে অদূরবর্তী ঘূর্ণির ফেনায়িত আবর্তের মাঝখানে।

কালাচাঁদ আবার কহিল, "তোমার বাড়ীতো কুমারহাটি, না ?"

মথুর বলিল "হুঁ।"

"আমার বাড়ী হল রায়পুরা। একই দেশের মানুষ তা হলে।"

"তা বইকি। না হলে আর সর্বনাশ করতে আসবে কেন ?"

জ্যোৎস্না আরও একটু উজ্জ্বল হইলে দেখা যাইত, সত্য সত্যই এক ধরণের লজ্জায় কালাচাঁদের কালো মুখ বেগুনে হইয়া উঠিয়াছে।

"ও কথা বলে আর লজ্জা দিও না। এখন আমাদের দু'জনেরই এক দশা। তোমার নামটি কি?" মথুর নাম বলিল।

"ব্রাহ্মণ!" কালাচাঁদ জিভ কাটিয়া কহিল, "ব্রহ্মস্ব লুট করতে গিয়েছিলুম, তাইতেই বুঝি এ দশা ঘটল ঠাকুর।"

"আর কখনও বুঝি ব্রহ্মস্ব লুট কর নি?"

"না জেনে কবার করেছি জানিনে, কিন্তু জানিতে একবার মাত্তর করেছিলুম। আর তার ছমাস বাদেই ত বউ মরল। পাপ কখনও চাপা থাকে না বাবাঠাকুর, ফল তার ভুগতেই হয়। ব্রাহ্মণ! ওরে বাবারে, সাক্ষাৎ আগুন।"

ব্রাহ্মণ-ভক্তির চোট দেখিয়া মথুর মুগ্ধ হইয়া গেল, অথচ মাত্র আধঘণ্টা আগেই রামদা বাগাইয়া এই লোকটাই যে তাহাকে কাটিতে আসিতেছিল, সে কথা এখন কে বিশ্বাস করিবে।

তারপর খানিকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। কালো আকাশ আর কালো জল—খানিকটা কাক-জ্যোৎস্না যেন তাহাদের মাঝখানে কুয়াসার একটা পর্দার মত দুলিতেছে। পাখার শব্দ বাজাইয়া গোটা কয়েক বাদুড় উড়িয়া চলিয়াছে, মরা জ্যোৎস্নায় তাহাদের ছায়া পদ্মার উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। নীচে জলের অবিশ্রাম গতি—সময়ের প্রবাহধারার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন কলরোল বহিয়া চলিয়াছে, যেন সময়ের

প্রান্তরেখায় না পৌঁছাইয়া সে ধারা আর থামিবে না। কাল যেমন তাহার বিরামবিহীন গতি ছন্দে সম্মুখে যাহা কিছু পায়, তাহাকেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হয় তেমনি করিয়া কীর্তি-নাশা পদ্মাও এই উন্মত্ত স্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে, তীরে তীরে তাহার ফেনার অট্টহাসি আর তরঙ্গের সংঘাত যেন ধ্বংসের উল্লাস জাগাইতেছে।

মানুষের দেহ মন,—দুইটা বস্তুকেই বিচিত্র বলিতে হইবে। এমন অবস্থার মধ্যেও মথুরের যেন ঝিম ধরিয়া আসিতেছিল, চট করিয়া তাহার চটকা ভাঙ্গিয়া গেল। সত্য সত্যই সে ঝিমাইতেছে নাকি! একবার হাত খুলিয়া পড়িয়া গেলেই আর দেখিতে হইবে না—একটি আকর্ষণে পদ্মা একেবারে পনের ষোল হাত দূরে টানিয়া লইয়া যাইবে। তখন ফিরিয়া আবার এই আশ্রয়টির কাছে আসা সামর্থ্যের বাহিরে।

চোখ মেলিয়া মথুর চাহিয়া দেখিল, তেমনি জলের মধ্যে আধখানা দেহ ডুবাইয়া কালাচাঁদ প্রাণপণ আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। চাঁদ তখন আরও একটু উপরে উঠিয়াছে—প্রায় মাথার উপর। সেই আলোয় মথুর আরও স্পষ্ট করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল, মনে হইল যেন একটা শিথিল ক্লান্তি তাহার সমস্ত দেহ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছ হে?"

ক্লিষ্টস্বরে কালাচাঁদ উত্তর দিল, "ভালো নেই ঠাকুর মশাই।

জলে পড়বার আগেই কেমন একটা চোট পেয়েছিলাম, ভিজে ভিজে আর জোর পাচ্ছিনা গায়ে, বেশীক্ষণ হাত দিয়ে যে ধ'রে রাখতে পারব এমন ভরসা নেই।"

"ওপরে উঠতে পারবে?"

উপরে দুইজনের জায়গা হইবার কথা নয়, তবু এই পরম বিপদের মুহূর্তে একান্ত শত্রুও কেমন করিয়া যেন মথুরের সমবেদনা আকর্ষণ করিয়া বসিল। শুধু আকর্ষণ করিল যে তাহাই নয়, সে নিজের আশ্রয়ের আধেকটুকুও এখন কালা-চাঁদকে ভাগ করিয়া দিতে চায়।

কিন্তু অবস্থাচক্রে কেমন করিয়া যেন সে উদারতা কালা-চাঁদকে আসিয়াও স্পর্শ করিয়াছে।

"না ঠাকুর মশায়, দুজনের জায়গা হবে না ওখানে। তা ছাড়া শরীরে এমন বল নেই যে, আর একটুও উঠে আসতে পারি। হাত পা আমার অসাড় হয়ে যাচ্ছে।"

"তা হলে?"

"আর উপায় নেই ঠাকুর মশাই, মরণ আমার ঘনিয়ে এসেছে। তার আগে—"

ঝর-ঝর-ঝরাং—

কোথা হইতে একটা প্রচণ্ড শব্দ মুহূর্তে চারিদিক মুখর করিয়া তুলিল। পদ্মা ভাঙ্গিতেছে—ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। মানুষের নীড়, মানুষের সর্বস্ব। কোথায় যেন একটা মস্ত

ভাঙ্গন নামিল। সাপের মত ক্রূর কুটি। জলরেখা, খলের মত দাঁত দিয়া মাটি কাটিতে থাকে, সকলের অগোচরে মাইলের পর মাইল জুড়িয়া মাটির বনিয়াদকে দংশনে দংশনে একবারে ঝাঁঝরা করিয়া দেয়। তারপর একদিন নিশুতি মধ্যরাত্রে অসহায় মানুষ যখন সর্বংসহা ধরণীর উপর সমস্ত বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করিতেছে, তখন অকস্মাৎ টলমল করিয়া আকাশ বাতাস টলিয়া ওঠে। পরক্ষণেই ভাঙ্গনের একটা রুদ্র গর্জন। সকালে উঠিয়া দেখা যায় ঘর নাই, বাড়ী নাই, মানুষের বসতির চিহ্নটি অবধি নাই—দিক দিগন্তব্যাপী জল আর জল।

পদ্মা ভাঙ্গিতেছে, আরও ভাঙ্গিতেছে। ওই শব্দটা যেন পৃথিবীর একটানা একটা কান্নার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে—মরণের রাক্ষস মুষ্টির নীচে অসহায় শিশুর অন্তিম আর্তনাদ।

কালাচাঁদ কহিল, "তুমি আমার দেশের মানুষ ঠাকুর মশাই, মরবার আগে তোমার কাছে একটা নিবেদন জানাতে চাই।"

মথুর বেদনা বোধ করিয়া কহিল, "বালাই, মরবে কেন? আর তিন চার ঘণ্টার বেশী রাত্তির নেই, এর মধ্যে যদি কোনো বড় জাহাজ এসে পড়ে তো ভালোই, নইলে দিনের বেলা যে করে হোক একটা উপায় হবেই।"

"তিন চার ঘণ্টা!" কালাচাঁদ ম্লান ভাবে হাসিবার চেষ্টা

করিয়া বলিল, "আমার হয়ে এসেছে। যে কটা কথা তোমায় বলবার আছে, এই ফাঁকেই তা বলে নিই। সংসারে থাকবার মধ্যে আছে মা-মরা একটা বার বছরের ছেলে, তা ছাড়া তিন-কুলে আর সব শত্তুর। হাতের কাছে তোমাকে ছাড়া এখন আর কাউকে পাই না বাবা ঠাকুর, তুমি রায়পুরা গিয়ে কালা-চাঁদ দুলের ঘর খুঁজলেই লোক আমার বাড়ী তোমায় দেখিয়ে দেবে। তুমি আমার ছেলেকে এই গেঁজেটা দিও, এর মধ্যে কয়েক ভরি সোণা আর খান কতক মোহর আছে। তা ছাড়া তাকে বলো উত্তরের পোঁতায়—"

মথুর হাত বাড়াইয়া গেঁজেটা তুলিয়া লইল।

—"উত্তরের পোঁতায় এক ঘটি"...

কিন্তু কথাটাও আর শেষ হইল না। এক হাত গেঁজেটা বাড়াইয়া দিতে গিয়া শিথিল দুর্বল বাঁ হাত খানি কালাচাঁদের নারিকেল গাছের গা হইতে পিছলাইয়া গেল। পরক্ষণেই ঝপাং করিয়া একটা শব্দ হইল। মথুর ঘোষাল বিস্ফারিত চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, পদ্মার প্রবল কালো স্রোতে কালাচাঁদের ঝাঁকড়া মাথাটা একবার ভাসিয়া উঠিয়াই পরক্ষণে মিলাইয়া গেল। যাইবার আগে তাহার সমস্ত বিশ্বাস এমন একজনকেই ন্যস্ত করিয়া গেল, মাত্র দু'ঘণ্টা আগেই দরকার হইলে অত্যন্ত অনায়াসে যাহাকে খুন করিতে তাহার বাধিত না।

বিশাল পদ্মা, তীক্ষ্ণ স্রোত, হাতের কাছে যাহা কিছু পায়

তাহাকেই টানিয়া লয় ঘূর্ণির অতল বিশাল গর্ভে। তীরে তীরে ভাঙ্গা গড়ার বিচিত্র লীলা। পৃথিবীকে ভাঙ্গিয়া সে নূতন করিয়া রচিতে পারে—হয়তো মানুষের মনকেও।

সকালের যাত্রীবাহী ষ্টীমার এস-এস এমু আসিয়া মথুরকে উদ্ধার করিল।

শেষ

আমাদের প্রকাশ-পরিকল্পনা

অন্তরাল [নাটক]—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চীট্ [উপন্যাস]—অনুবাদক—মৃণাল সেন

তীর ও তরঙ্গ [উপন্যাস]—শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

দ্বীপপুঞ্জ [উপন্যাস]—নরেন্দ্রনাথ মিত্র

জনকল্যাণে সোভিয়েট বিজ্ঞান—অধ্যাপক জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম—শ্রীঅনাদিনাথ পাল

দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লেনিনের স্মৃতি [ক্রুপ্‌স্‌কায়া]—অনুবাদক শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাযুদ্ধে সোভিয়েট—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গদর আন্দোলনের ইতিহাস—শ্রীসঞ্জয়

সবার সাথে [গল্প]—শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

সংক্রান্তি [উপন্যাস]—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ [শিশুনাট্য]—মৃণাল সেন

তরঙ্গ [নাটক]—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়